ফুলমালা

লীলা মজুমদার

ফুলমালা

সম্পাদনায়
লীলা মজুমদার

নন্দিতা পাবলিশার্স
৮/১ সি. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

মূল্য—সাত টাকা

প্রকাশকঃ রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র, নন্দিতা পাবলিশার্স, প্রচ্ছদ ঃ অঞ্জন ঘোষ, অলংকরণ ঃ তাপস দত্ত, মুদ্রাকর ঃ আশীষ চৌধুরী, জয়দুর্গা প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

সূচীপত্র

ভূমিকা

বলা যেতে পারে যে ১৮৯২ সালে প্রকাশিত, যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'হাসি ও খেলা' দিয়ে বাংলা শিশু সাহিত্যের পত্তন হয়েছিল। 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'হাসি ও খেলা' বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে-সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই ; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই···বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের ও শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন···"

সে বই নিতান্ত শিশুদের উপযুক্ত ছিল। কিন্তু সে দিন থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে বাংলা শিশু সাহিত্য বলিষ্ঠ ও বহুমুখী হয়ে উঠছে। অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে সে নিত্য নব দিগন্তের দিকে যাত্রা করেছে। জ্ঞান এবং রসের এমন অপূর্ব সমাবেশের কথা কে ভাবতে পেরেছিল ?

এই ছোট বইখানিতে সেই চির-নবীন যুগের মাত্র কয়েকজনের রচনা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ষোলো রকম মেজাজের ষোলোটি গল্প। এগুলি পড়ে নবীন পাঠকরা সমান পরিমাণে আনন্দ ও শিক্ষা পাবে, এই আশায় বইটি তাদের হাতে দিলাম।

ইতি—

লীলা মজুমদার, সম্পাদক।

ঢেঁকিটা টপকিয়ে দিলে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মানুষ দুলিয়ে ঘোরাতে লাগল। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়। একজনের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে পাখীর মতো সুট করে বেরিয়ে গেল। দশ-বিশ ক্রোশ দূরে ডাকাতি সেরে সেই রাত্রেই ভালো-মানুষের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হতে পারে তাও দেখালে।

খুব বড় একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড় করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা। এই লাঠিকে বলে রণ্পা। দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের ওপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হত, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হত বেশী।

যদিও ডাকাতি করবার মতলব মাথায় ছিল না, তবু এক সময়ে এই রণ্পায়ে চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। ডাকাতি খেলার এইরকম ছবি শ্যামের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধ্যে কাটিয়েছি দুহাতে পাঁজর চেপে ধরে।

ছুটির রবিবার। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিটে আলোতে বুক ধুকধুক করছিল।

পরদিন ছুটির ফাঁকে পাল্কিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চাকায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিঝুম অন্ধকারের নাড়ীতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই-হুই হাঁই-হুই, গা করছে ছমছম। ধু ধু করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে। দূরে ঝিক্ ঝিক্ করে কালী দীঘির জল, চিক্ চিক্ করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ডালপালা ছড়ানো পাকুড় গাছ ফাটল ধরা ঘাটের দিকে।

গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায় ঘন বেতের ঝোপে। যত এগোচ্ছি, দুর দুর করছে বুক। বাঁশের লাঠির আগা দুই-একটা দেখা যায় ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখানে। জল খাবে, ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়। তারপরে ?

রে রে রে রে রে রে

ইন্দ্র হওয়ার সুখ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

দেবতাদের যিনি রাজা, তাঁহাকে বলে ইন্দ্র। তাঁহার কথা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তাঁহার এক হাজার চক্ষু আর সবুজ রঙের দাড়ি ছিল। তাঁহার আসল নাম শত্রু, পিতার নাম কশ্যপ, রাণীর নাম শচী, পুত্রের নাম জয়ন্ত, হাতির নাম ঐরাবত, ঘোড়ার নাম উচ্চৈঃশ্রবা, সারথীর নাম মাতলী, সভার নাম সুধর্ম্ম, বাগানের নাম নন্দন, আর অস্ত্রের নাম বজ্র। তাঁহার সভায় গন্ধর্বেরা গান গাইত, অপ্সরারা নাচিত। লোকে ভাবিত, ইন্দ্র বড়ই সুখে থাকেন, আর অনেক সময়ই যে তিনি খুব জাঁক-জমকের ভিতর দিন কাটাইতেন, একথা সত্যও বটে। কিন্তু সময় সময় তাঁহাকে বেগও কম পাইতে হইত না। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল, আর সেই সূত্রে অসুরেরা মাঝে মাঝে ইন্দ্রকে বড়ই নাকাল করিত। দেবতা আর অসুরের যুদ্ধে একবার বৃত্র নামে একটা অসুর ইন্দ্রকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল। দেবতারা তখন অনেক বুদ্ধি করিয়া সেই অসুরটাকে 'জম্ভিকা' অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারেন, তাই ইন্দ্র রক্ষা পান, নচেৎ সে যাত্রা আর তাঁহার বিপদের সীমাই ছিল না। জম্ভিকা অস্ত্রের গুণ অতি আশ্চর্য। সে অস্ত্র গায়ে লাগিবা মাত্র অসুরটা ভয়ানক হাই তুলিল আর ইন্দ্র সেই ফাঁকে তাহার পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই যুদ্ধ ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতেই আবার ইন্দ্রের এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্বে কোন কারণে তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বৃত্রের মৃত্যুর পরে সেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বেচারা ভয়ে অস্থির হইয়া যেখানেই পলাইতে যান, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়। শেষে আর

উপায় না দেখিয়া, তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে, পদ্মের মৃণালের ভিতর গিয়া সূতা হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। তখন কাজেই ব্রহ্মহত্যা ঠকিয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে তাহাকে সহজে ছাড়ে নাই, সে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বৎসর সেইখানে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

সাড়ে তিন লক্ষ বছর ত আর একদিন দুদিনের কথা নহে, দেবতাদের হিসাবেও তাহা এক হাজার বৎসর। কাজেই দেবতারা তাঁকে এত দিন দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মার কথায় যদিও তাঁহার সন্ধান পাইলেন তথাপি তাঁহাকে ঘরে আনিতে সাহস পান নাই, কারণ ব্রহ্মহত্যা তখনও তাঁহার জন্য সেখানে বসিয়া আছে, সে তাহাকে সহজে ছাড়িবে কেন? তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করাইয়া ইন্দ্রের শরীরের পাপ ধুইয়া ফেলিবেন, তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে গৌতমী নদীতে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। গৌতম যার পর নাই রাগিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'সে হইবে না, এই পাপীকে এখানে স্নান করাইলে আমি তোমাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব। তোমরা শীঘ্র এখান হইতে যাও।"

এ কথায় দেবতারা নর্মদার জলে ইন্দ্রকে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম ছিল। মাণ্ডব্য মুনি বিষম ভ্রূকুটির সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন—'এখানে যদি ইহাকে স্নান করাও, তবে এখনি তোমাদের শাপ দিয়া ভস্ম করিব।'

যাহা হউক, শেষে দেবতারা অনেক স্তুতি মিনতি করায় মাণ্ডব্য ইন্দ্রকে সেখানে স্নান করাইতে দিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌতমীতে নিয়াও স্নান করান হইল। ইহার পর আবার ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলুর জল দিয়া ইন্দ্রকে ধুইলেন, তবে সে যাত্রার মত তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাস্তবিক, ইন্দ্র হওয়া আগাগোড়াই সুখের কথা ছিল না। কিন্তু লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড় সুখী। তাই অনেকে ইন্দ্র হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিত। সেজন্য কাহাকেও খুব তপস্যা করিতে দেখিলেই ইন্দ্র ভাবিতেন—'সর্বনাশ! এইবার বুঝি বা আমার কাজটি যায়!' তখন তিনি সেই লোকটির তপস্যা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক একজন লোক ইন্দ্র হইয়া যাইত।

নহুষ নামে এক রাজা একবার ইন্দ্র হইয়া কি হুলস্থুলই বাধাইয়া দিলেন! উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতে তাঁহার মন উঠিল না, তিনি বলিলেন, 'আমি বড় বড় মুনিদের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়াইব!' অমনি এক আশ্চর্য পাল্কী প্রস্তুত হইল, মুনিরা হইলেন তাহার বেহারা।

সে বেচারাদের গায়ে জোর কম। ফলমূল খাইয়া থাকেন, পাল্কী বহার অভ্যাস কাহারও নাই, তাঁহাদের কাজে নহুষের মন উঠিবে কেন? নহুষ তখন বেজায় চটিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মাথায় ধাঁই শব্দে এক প্রচণ্ড লাথি লাগাইয়া দিলেন। তাহার ফলও পাইলেন হাতে-হাতেই, কেননা তাহার পরমুহূর্তেই মুনির শাপে তাঁহার সেই সুখের ইন্দ্রগিরি ঘুচিয়া গেল, আর তিনি এক প্রকাণ্ড সাপ হইয়া হিমালয়ের নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

আর একবার অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে, কিন্তু কেহই জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না। সে সময়ে পৃথিবীতে রজি নামে একজন অতিশয় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। দুই দলই ভাবিলেন,—'এই রজিকে আনিয়া আমাদের সঙ্গে জুটাইতে পারিলে আমরা নিশ্চয় জিতিব।'

এই ভাবিয়া দেবতারা রজিকে আসিয়া বলিলেন,—'হে রাজন, তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিয়া অসুর বধ কর, নাহিলে আমরা কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না।' রজি বলিলেন, 'আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিতে পারি।'

দেবতারা বলিলেন, 'অবশ্য তোমাকে আমরা ইন্দ্র করিব, তুমি শীঘ্র আইস।'

এই বলিয়া দেবতারা সবে চলিয়া গিয়াছেন, অমনি অসুরেরা আসিয়া রজিকে বলিল, 'মহারাজ, আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন।'

রজি দেবতাদিগকে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি অসুরদিগকেও বলিলেন, 'আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের কথায় রাজি আছি।'

কিন্তু, অসুরেরা সে কথায় অতিশয় ঘৃণার সহিত বলিল, 'এমন সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ। আর কোন ইন্দ্র আমরা চাই না। আপনি না হয় আমাদের পক্ষে নাই আসিলেন।'

তখন রজি দেবতাদের সঙ্গে জুটিয়া ভয়ানক রাগের সহিত অসুর মারিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেবতাদের জয়লাভ হইল। ইন্দ্র দেখিলেন, এখন ত বড়ই বিপদ উপস্থিত, রজিকে এখন সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তিনি কিছু বলিবার আগেই তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ! লোকে বলে, যে রক্ষা করে, সে পিতা। আপনি আমাকে ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই আপনি আমার পিতা হইলেন। আর তাহাতেই আপনি ইন্দ্রও হইলেন, কেননা ইন্দ্রের পিতা হইলে আর ইন্দ্র হওয়ার চেয়ে বেশী বই কম কি হইল?'

রজিও ইন্দ্রের সেই ফাঁকিতে ভুলিয়া আহ্লাদের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিলেন, স্বর্গে রাজা হওয়ার কথা আর মুখে আনিলেন না।

এই রজির পাঁচশত মহাবীর পুত্র ছিল। রজির মৃত্যুর পরে এই পাঁচশত বীর মিলিয়া যুক্তি করিল যে 'দেবতারা ফাঁকি দিয়া আমাদের পিতাকে ইন্দ্রপথ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, আইস, আমরা তাহার শোধ লইব।'

এই বলিয়া তাহারা দেবতাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, আর দেখিতে দেখিতে দলবল সহিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গ আর পৃথিবী দুইই দখল করিয়া বসিল।

এই পাঁচশত ভাই যেমন বীর, তেমনি যদি বুদ্ধিমান হইত তবে আর ইন্দ্রের নিজরাজ্য ফিরিয়া পাইবার কোন উপায়ই থাকিত না। কিন্তু ইহারা বুদ্ধিমানের মতন ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্যপালন করার বদলে, নানারূপে অসৎ কার্যে নিজেদের বিষয় ও বল নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার ফলে, অল্পদিনের ভিতরেই ইন্দ্র তাহাদিগকে তাড়াইয়া আবার আসিয়া স্বর্গের রাজা হইলেন।'

বাঘে কুমিরে

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

একবার দাক্ষিণাত্যে, নর্মদা নদীর তীরে, কোন এক গ্রামে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়। স্থানীয় বনে-জঙ্গলে বাঘ এত বেশি যে, সাধারণতঃ গ্রামবাসীরা বাঘের নামে তেমন ভয় পায় না। সে আসে রাত্রিযোগে, কচিৎ-কদাচিৎ দু' একটা ছাগল, ভেড়া বা বাছুর লইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সেবার একদিন সকালে চারিদিকে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কি ব্যাপার? গ্রামের মোড়লের একটা প্রকাণ্ড হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়কে পাওয়া যাইতেছে না। খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। ষাঁড়টাকে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু রাত্রে যে কোন ব্যাঘ্র মহাপ্রভু তাহাকে লইয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। মোড়ল ত চটিয়া আগুন। তাহার হুকুমে তখনই একদল বলিষ্ঠ লোক বাঘের সন্ধানে বাহির হইল। তাহারা সন্ধ্যার একটু পূর্বে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, বাঘটা খুব বড়। সে নদীর ধারে একটা ঝোপে বসিয়া সেই ষাঁড়ের মাংস পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছে।

অমনি বাছা বাছা কয়েকজন শিকারী অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা প্রথমে আগুন জ্বালাইয়া, চীৎকার করিয়া বাঘটাকে সেই ঝোপ হইতে তাড়াইয়া দিল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝোপের কাছাকাছি একটা গাছের উপর মাচা বাঁধিয়া ফেলিল। গাছটা তেমন উচ্চ নহে।

সন্ধ্যার পর একজন ওস্তাদ শিকারী একটা প্রকাণ্ড বর্শা লইয়া সেই মাচার উপর উঠিয়া বসিল। অস্ত্রটি একেবারে ক্ষুর-ধার। দলের আর সকলে কতকটা আড়ালে

গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শিকারীকে কেবলমাত্র তাহার স্থির লক্ষ্য ও কব্জীর জোরে বাঘটাকে হত্যা করিতে হইবে। অস্ত্র ফস্‌কাইলে আর রক্ষা নাই। ক্রোধোন্মত্ত বাঘ তখন মাচার উপরে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রাণসংহার করিবেই। যাহা হউক, রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময় বাঘটা খাদ্যের লোভে সেই ঝোপের ধারে অতি সন্তর্পণে উপস্থিত হইল। মানুষের গন্ধ পাইলেও তাহার ক্ষুধার জ্বালা এত অধিক যে, সে এদিক্-ওদিক্ না তাকাইয়াই ঝোপে ঢুকিয়া আহার করিতে বসিল। অন্ধকার তখন খুব গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ওস্তাদ শিকারী পাতার মর্মর শব্দ শুনিয়াই বাঘের আগমন বুঝিতে পারিল। তারপর স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকার ঝোপের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে বাঘের চোখ দুইটি দেখিতে পাইয়াই, সে সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করিল। এমনি তাহার হাতের কায়দা যে, অস্ত্রটা বাঘের পায়ের হাড় পর্যন্ত এফোঁড়্-ওফোঁড় না করিয়া ছাড়িল না। বাঘ রাগে উত্তেজিত হইয়া গর্জন করিতে করিতে সম্মুখের দিকে দিল এক প্রচণ্ড লাফ। সেই এক লাফে শিকারী যে-গাছে ছিল, একেবারে ঠিক তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। গাছটি থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের পা হইতে বর্শাটিও খুলিয়া গেল। শিকারীর ত চক্ষুস্থির। তাহার হাতে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না।

এদিকে বাঘের গর্জন শুনিবামাত্র দূরের লোকেরা ঢাক-ঢোল পিটাইয়া ও আগুন জ্বালাইয়া সেই দিকেই ছুটিয়া আসিল। আগুন দেখিয়া আহত বাঘ কোথায় সরিয়া পড়িল। কাছাকাছি অনেক ঝোপ্-ঝাপ্ খোঁজা হইল, কিন্তু বাঘের মৃতদেহ কোথাও পাওয়া গেল না। সে যে বেশি রকম জখম হইয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সেই রাত্রির মত সকলে গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

মোড়ল কিন্তু নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। এবার অন্য উপায়ে বাঘকে হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই উপায়টি এ দেশের বন্য জাতেরা প্রায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। কোথাও বাঘের অত্যাচার আরম্ভ হইলে, গ্রামবাসীরা তাহার ভুক্তাবিশিষ্ট মাংসে একপ্রকার তীব্র বিষ মাখাইয়া রাখে। সেই মাংস আহার করিবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বিষের কার্য আরম্ভ হয়। বাঘ অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়ে। তাহার বুক ও জিব শুকাইয়া আসে। সে তখন নিকটবর্তী জলাশয়ে গিয়া দারুণ পিপাসা দূর করিবার চেষ্টা করে। এইভাবে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে করিতে বাঘের মৃত্যু হয়।

এরূপ ঘটনা মোড়ল অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও সেই উপায়ে বাঘটা নিহত করিবে, স্থির করিল। ষাঁড়ের তখনও কতকটা অবশিষ্ট ছিল। সে বিশেষভাবে জানিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাংসের কিছুমাত্র বাকি থাকিবে, ততক্ষণ বাঘ কোথাও নড়িবে না। সেইটুকু নিঃশেষ করিয়া তবে অন্যত্র যাইবে। পরদিন সকালে মোড়লের পরামর্শ

মত সেই ভয়ানক বিষ ষাঁড়ের ছিন্নভিন্ন মাংসে মাখাইয়া রাখা হইল ; এবং সে নিজে সন্ধ্যার পরে ঝোপের কাছাকাছি নদীর ধারে, একটা গাছে বন্দুক লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মোড়ল যাহা ভাবিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিল। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া রাত্রি প্রায় তিনটার সময় বাঘ আসিয়া উপস্থিত। কয়েকটা শৃগাল আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ বিষের গন্ধ পাইয়া মাংস আহার করে নাই। বাঘ আসিবামাত্র তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। ক্ষুধিত বাঘ কিন্তু বিষের অস্তিত্ব কল্পনাও করে নাই। সে মহানন্দে আহার করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরেই বিষের কার্য আরম্ভ হইল। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিবার উপক্রম। করুণ আর্তনাদ করিতে করিতে সে নদীর দিকে ছুটিল।

তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। মোড়ল বন্দুক লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। বাঘ কোন দিকে না চাহিয়া, একেবারে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং চক্ চক্ করিয়া জল খাইতে লাগিল। জল খাওয়া শেষ হইলে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে আর একটা ঝোপের কাছে গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বুকের জ্বালা এদিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে, সে আবার জল খাইতে ছুটিল।

বাঘের এই যাতনার অবস্থা দেখিয়া মোড়লের আর রাগ রহিল না। গুলি করিয়া সে তাহার কষ্টের লাঘব করিতে মনস্থ করিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মোড়ল বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার পূর্বেই, একটা বৃহৎ কুমীর আসিয়া বাঘের ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। তারপর মরণাপন্ন বাঘে ও কুমীরে কি ভীষণ লড়াই! মোড়ল বন্দুক নামাইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। লড়াইয়ের উত্তেজনায় বাঘ কিছুকালের জন্য সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল।

কুমীর বাঘের থাবার আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে জলের ভিতর টানিতে চেষ্টা করিতেছিল ; বাঘও প্রাণপণ বলে জল তোলপাড় করিয়া, কুমীরকে ডাঙায় তুলিবার জন্য ব্যস্ত। একবার দুইটাই ডুবিয়া যায় ; পরক্ষণেই আবার বাঘ মাথা তুলিয়া উঠে। কুমীর কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাহার কামড় ছাড়ে নাই। শেষে কুমীরেরই জিত হইবার উপক্রম হইল। বিষের জ্বালা এবং কুমীরের আক্রমণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাঘ আর্তনাদ করিতে করিতে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল। ইহার পর কুমীর যেই মাথা তুলিয়া বাঘকে জলের তলে টানিতে যাইবে, মোড়ল অমনি নিমেষমধ্যে অব্যর্থ গুলির আঘাতে তাহাকে বিনাশ করিল। মোড়ল পরের গুলিতে বাঘকেও সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিল।

রিদয়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চকা বললে—"এই বাগানে, বনে যে তুমি আজকাল একলাটি ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ, এটা ভালো হচ্ছে না।"

রিদয় ভাবলে, এইবার যেতে হল রে।

চকা বলে চলল—"এই বনে তোমার কত শত্রু রয়েছে, তা জানো? প্রথম হচ্ছে শেয়াল, সে তোমার গন্ধে-গন্ধে ফিরছে, সুবিধে পেলেই ধরবে। তারপর ভোদড় ভাম দুজনে আছে—যেখানে-সেখানে গাছের কোটরে ঢুকতে গেলে বিপদে পড়বে কোনদিন। জলের ধারে উদ্‌বেরাল আছে—একলা চান করবার সময় সাবধান। যেখানে-সেখানে জড়ো-করা পাথরের উপরে বসতে যেও না, তার মধ্যে বেঁজি লুকিয়ে থাকতে পারে। শুকনো পাতা-বেছানো জায়গা দেখলেই সেখানে শুতে যেয়ো না; পাতাগুলো নেড়ে, তলায় সাপ কি বিছে আছে কিনা, দেখা ভালো। মাঠ দিয়ে যখন চল, তখন আকাশের দিকে কি একবার চেয়ে দেখ—সেখানে বাজ-পাখি, চিল, কাক, শকুনি আছে কিনা? সেটা একবার-একবার দেখে চলা মন্দ নয়। ফস-করে ঝোপে-ঝাড়ে উঠতে যেয়ো না; গেরো-বাজগুলো অনেক সময় সেখানে শিকার ধরতে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হলে কান পেতে শুনবে, কোন দিকে পেঁচা ডাকল কিনা। পেঁচারা এমন নিঃশব্দে উড়ে আসে যে টের পাবে না কখন ঘাড়ে পড়ল!"

তার এত শত্রু আছে শুনে রিদয় ভাবলে বাঁচা তো তাহলে শক্ত দেখছি। সে চকাকে বললে—"মরতে ভয় নেই। তবে শেয়াল-কুকুরের কিম্বা শকুনের খাবার হতে আমি রাজি নই। এদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কিছু আছে বলতে পার?"

চকা একটু ভেবে বললে—"বনের যত ছোট পাখি আর জন্তু এদের সঙ্গে ভাব করে

ফেলবার চেষ্টা কর ; তাহলে কাঠঠোকরা, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, খরগোস, তালচড়াই, বুলবুলি, টুনটুনি, শ্যামা, দোয়েল, এরা তোমায় সময়-মতো সাবধান করে দেবে ; লুকোবার জায়গাও দেখিয়ে দেবে। আর দরকার হয় তো এই সব ছোট জানোয়ারেরা তোমার জন্যে প্রাণও দিতে পারে।"

চকার কথা-মতো সেই দিনই রিদয় এক কাঠবেড়ালির সামনে উপস্থিত—ভাব করতে। যেমন দৌড়ে রিদয়ের সেদিকে যাওয়া, অমনি কাঠবেড়ালির গিয়ে গাছে ওঠা ; আর ল্যাজ-ফুলিয়ে কিচ-কিচ করে গালাগালি শুরু করা—"অত ভাবে আর কাজ নেই! তোমাকে চিনিনে? তুমি তো সেই আমতলির রিদয়। কত পাখির বাসা ভেঙেছ, কত পাখির ছানা টিপে মেরেছ। ফাঁদ পেতে, ধামা চাপা দিয়ে কত কাঠবেড়ালি ধরে খাঁচায় পুরেছ, মনে নেই? এখন আমরা তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাব? এই ঢের যে বন থেকে আমরা এখনো তোমায় তাড়িয়ে মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছিনে! যাও, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। সরে পড় বাসার কাছ থেকে।"

অন্য সময় হলে রিদয় কাঠবেড়ালিকে মজা দেখিয়ে দিত! কিন্তু এখন সে ভালো মানুষ হয়ে গেছে ; আস্তে-আস্তে হাঁসকে এসে সব খবর জানালে। খোঁড়া হাঁস বললে—"অত দৌড়ে কাঠবেড়ালের কাছে যাওয়াটা ভাল হয়নি। হঠাৎ কিছু-একটা এসে পড়লে সব জানোয়ারই ভয় পায়, রাগ করে। যখন জানোয়ারদের কাছে যাবে—সহজে, আস্তে, ভদ্রভাবে যাবে। হুটোপাটি করে কিম্বা চুপিচুপি চোরের মতো গেলেই তাড়া খাবে। তোমার স্বভাব একটু ভালো হয়ে এসেছে ; এমনি আর দিনকতক ভালমানুষটি থাকলেই ওরা আপনিই তোমার সঙ্গে ভাব করবে। তুমি যদি তাদের উপকার কর, তবে তারাও তোমার সহায় হবে—বনের এই নিয়ম জেনে রাখ।"

রিদয় সারাদিন ভাবছে, কেমন করে সে বনের পশু-পাখিদের কাজে লাগতে পারবে, এমন সময় খবর হল, বেতগাঁয়ের একটা চাষা কাঠবেড়ালির বৌকে ধরে খাঁচায় বন্ধ করেছে ; আর সে বেচারার আটদিনের বাচ্চাগুলি না খেয়ে মরবার দাখিল। খোঁড়া হাঁস রিদয়কে বললে—"দেখ, যদি কাঠবেড়ালির উপকার করতে চাও তো এই ঠিক সময়।" রিদয় অমনি কোমর বেঁধে সন্ধানে বেরুল।

কাঠবেড়ালির বৌটি ছিল একেবারে সাদা ধপধপে ; তার একটা রোঁয়াও কালো ছিল না। চোখ-দুটি মানিকের মতো লাল টুকটুকে, পাগুলি গোলাপী ; এমন কাঠবেড়ালী আলিপুরেও নেই। এ এক নতুনতর ছিষ্টি। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, রেল-কোম্পানীর সায়েব-সুবো তাকে ধরতে কত ফাঁদই পেতেছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত কাঠবেড়ালি ধরা দেয়নি। পৌষ-পার্বণের দিন বাদামতলী দিয়ে আসতে আসতে এক চাষা এই

কাঠবেড়ালিকে ঢোকা চাপা দিয়ে হঠাৎ কেমন করে পাকড়াও করে ঘরে এনে একটা বিলিতি-ইঁদুরের খাঁচায় বন্ধ করলে। পাড়ার লোক, ছেলে-বুড়ো, এই আশ্চর্য কাঠবেড়ালি দেখতে দলে দলে ছুটে এল। এক ডোম তার জন্যে এক চমৎকার খাঁচা-কল তৈরি করে এনে দিলে। খাঁচার মধ্যে শোবার খাট, দোলবার দোলনা, দুধের বাটি, খাবার খৈ রাখবার ঝাঁপি, বসবার চৌকি—এমনি সব ঘর-কন্নার ছোট-ছোট সামগ্রী দিয়ে সাজানো। সবাই ভাবলে, এমন খাঁচায় কাঠবেড়ালি সুখে থাকবে—খেলে বেড়াবে সারাদিন, দোলনায় দুলবে আর খৈ-দুধ খেয়ে মোটা হবে। কিন্তু কাঠবেড়ালি-বৌ চুপটি করে মুখ লুকিয়ে খাঁচার কোণে বসে রইল, আর থেকে-থেকে কিচ-কিচ করে কাঁদতে থাকল। সারাদিন সে কিছু মুখে দিলে না, দোলনাতেও দুললো না, চৌকিতেও বসল না, খাটেও শুল না; কেবলি ছটফট করতে লাগল আর কাঁদতে থাকল।

সুরেশ্বরের পুজো দেবার জন্যে চাষার বৌ সেদিন মালপো ভাজছিল আর সব পাড়ার মেয়েরা পিঠে-পার্বণের পিঠে গড়ছিল। ওদিকে উঠোনের বাইরে বেড়ার গায়ে কাঠবেড়ালির খাঁচাটার দিকে কি হচ্ছে, কেউ দেখছে না। চাষার দিদিমা বুড়ি সে আর নড়তে পারে না, দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে সেই কেবল দেখছে—রান্নাঘরের আলো গিয়ে ঠিক কাঠবেড়ালির খাঁচার কাছটিতে পড়েছে, আর সারা-সন্ধ্যে কাঠবেড়ালিটা খাঁচার মধ্যে খুটখাট ছটফট করে বেড়াচ্ছে। কাঠবেড়ালি বুড়ো-আংলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললে; তারপর বুড়ো-আংলার কাটি-বেয়ে নিচে নেমে চোঁচা দৌড় দিল বনের দিকে। বুড়ি ভাবছে, যাক্, আর আসে কিনা! এমন সময় দেখলে বুড়ো-আংলা ছুটতে ছুটতে আবার খাঁচার কাছে দৌড়ে গেল—হাতে তার দুটো কি রয়েছে। বুড়ি তা দেখতে পেলে না, কিন্তু এটুকু সে পষ্ট দেখলে যে বুড়ো-আংলা একটা পোঁটলা মাটিতে রেখে, আর-একটা নিয়ে খাঁচার কাছে উঠল; তারপর এক হাতে খাঁচার কাটি ফাঁক করে জিনিষটা খাঁচার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে, মাটি থেকে অন্য জিনিষটা নিয়ে আবার তেমনি করে খাঁচায় দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। সে ভাবলে, যাক্ বোধ হয় তার জন্যে সাত-রাজার ধন মাণিক-জোড় রেখে পালাল। খাঁচাটা খুঁজে দেখতে বুড়ি উঠল। বুড়ির কালো-বেড়ালও এতক্ষণ খাঁচার দিকে নজর দিচ্ছিল, সেও উঠে অন্ধকারে গা-ঢাকা হয়ে দাঁড়াল কি হয় দেখতে। দিদিমা উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, যাক্ আগের মতো খাঁচার কাছে গেল, কিন্তু বেড়ালের চোখ অন্ধকারে জ্বলছে দেখে, সে যেখানকার সেইখানেই দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল—ছানা দুটি বুকে নিয়ে। উঠোনে বুড়িকে

দেখে ছুটে এসে তার হাতে একটি ছানা দিয়ে বুড়ো-আংলা আগের মতো কাটি-বেয়ে একটির পর একটি ছানাকে খাঁচায় পুরে দিয়ে বুড়িকে পেন্নাম করে চলে গেল।

বুড়ি ঘরে এসে সবার কাছে এই গল্প করলে, কিন্তু কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চাইলে না—দিদিমা স্বপ্ন দেখেছে বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু বুড়ি বলতে লাগল—"ওরে, তোরা দেখে আয় না!"

সকালে সত্যি দেখা গেল চারটে ছানাকে নিয়ে কাঠবেড়ালি দুধ খাওয়াচ্ছে। এমন ঘটনা কেউ দেখেনি। সুরেশ্বরের মোহন্ত পর্যন্ত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে হাতি চড়ে চাষার বাড়ি উপস্থিত। ওদিকে চাষার বৌ যত পিঠে সিদ্ধ করে, সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সুরেশ্বরের মালপো ভোগও হয় না। তখন মোহন্ত পরামর্শ দিলেন—"ওই কাঠ-বেড়ালি নিশ্চয় সুরেশ্বরী, নয় আর কোন দেবী, ওকে ছানা-পোনা সুদ্ধ বন্ধ করেছে, হয়ত সুরেশ্বর তাই রাগ করেছেন। না হলে মালপো-ভোগ, পিঠে-ভোগ হঠাৎ পুড়েই বা যায় কেন? যাও, এখনি ওঁদের যেখানে বাসা, সেইখানে দিয়ে এস। না হলে আরো বিপদ ঘটতে পারে।"

চাষা তো ভয়ে অস্থির। গ্রামসুদ্ধ কেউ আর খাঁচায় হাত দিতে সাহস পায় না। তখন সবাই মিলে দিদিমাকে সেই খাঁচা নিয়ে বনে কাঠবেড়ালির বাসায় পাঠিয়ে দিলে। বুড়ি যেখানকার জিনিষ সেখানে রেখে আসবার সময় রাস্তার মাঝে একটা মোহর পেয়ে গেল।
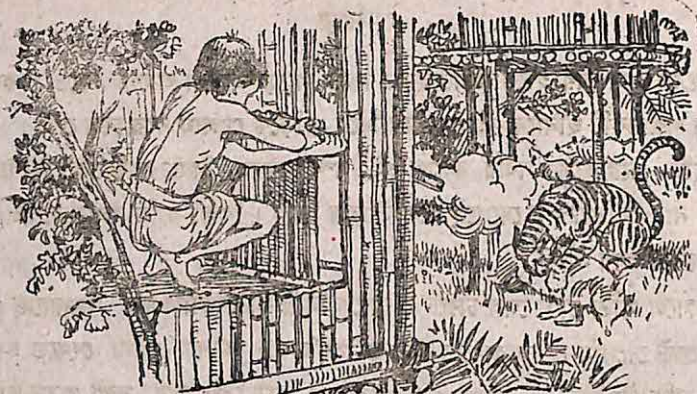
বনের খবর

প্রমদা রঞ্জন রায়

বাঘেরা বেশ জানে যে সে-বনের ভিতর তারাই রাজা। বেলা সাড়ে আটটার সময় ঘোড়ায় চড়ে একটা নদী পার হচ্ছি, সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন লোক। নদীর মাঝামাঝি এসে দেখি এই বড় একটা বাঘ প্রায় আমাদের রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই জল খাচ্ছে। আমরা যে আসছি সেজন্য তার কোন ভাবনা চিন্তাই নেই। দু-এক চুমুক জল খায় আর মাথা তুলে এক-একবার আমাদের দেখে নেয়। আমরা অনেক চ্যাঁচামেচি করাতে আস্তে আস্তে উঠে, রাজার মতো চালে সেখান থেকে চলল। দু-চার পা যায় আর ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর আমাদের দেখে। ততক্ষণে পিছন থেকে আমাদের আরও ঢের লোকজন এসে পড়েছে, সকলে মিলে মহা সোরগোল তুললে পর বাঘটা ছুটে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

সেখান থেকে একটা গ্রামে গিয়ে দুদিন ছিলাম। তারপর আমাদের ঐ পথেই ফিরতে হবে আর ঐ জায়গাতেই রাত কাটাতে হবে। গ্রামের প্রধান অনেক মানা করল, কিন্তু কিছুতেই আমাদের ফেরাতে না-পেরে, শেষটা দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে নিজেই বন্দুক হাতে আমাদের সঙ্গে চলল।

বিকেলে দুই নালার মোহনায় এসে তাঁবু খাটিয়েছি, চাকর-বাকররা কেউ রাঁধতে, কেউ খেতে, কেউ ব্য বাসন মাজতে ব্যস্ত। আমি তাঁবুর সামনে চেয়ারে বসে, পরদিনের কাজের পরামর্শ করছি। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল, নালার দুই মোহনার কাছে একটা বড় গাছের আড়াল থেকে গলা বাড়িয়ে একটা কি যেন আমাকে দেখছে। বার কয়েক আমি হঠাৎ কথা বন্ধ করে সেইদিকে তাকাতে কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। শেষটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম দুটো কী জিনিস জ্বল-জ্বল করে উঠল।

আর বুঝতে বাকী রইল না, ও দুটো বাঘের চোখ। অমনি তো আমি "বন্দুক আন্" বলে লাফিয়ে উঠেছি, আর বাঘও আর লুকিয়ে থেকে কোনো লাভ নেই দেখে

দুই লাফে একেবারে আমার পায়ের নিচে। ছ-সাত ফুট নিচে হবে, আর দূরও হবে ছ-সাত ফুট।

এদিকে খালাসী মশাইরা বাঘের নাম শুনেই যে যার কাজ ফেলে, তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দরজা এঁটে দিয়েছেন। বন্দুকটা এনে দিতে কারো সাহসে কুলোল না। অগত্যা নিজেই তাঁবুর ভিতর থেকে রিভলভারটা নিয়ে এলাম। কিন্তু এসে আর বাঘটাকে দেখতে পেলাম না। সে হল্লা শুনে বেগতিক বুঝে সরে পড়েছে। পাতার উপর মড়মড় পায়ের আওয়াজ শুনে, সেইদিকে দু-তিনবার আওয়াজ করলাম। এতক্ষণে খালাসীদের মুখে কথা ফুটল, একজন বলতে লাগল, "কেয়া দেখা হুঁ। এত্তা বড়া থা, উধারসে চলা গিয়া।"

একটা পাহাড়ে কাজ করতে গিয়েছিলাম, সেটাকে দূর থেকে দেখলে একটা দেয়াল বলে মনে হত। ঐ জঙ্গলে থাকতে হবে অন্তত দুই রাত, সেই মুসো বস্তি থেকে কুলি নিয়ে গিয়েছি। পাহাড়ের মাঝামাঝি আট-দশ ইঞ্চি চওরা একটু পথ, মুসোদের শিকারের রাস্তা, তার নিচেই একেবারে খাড়া দেয়ালের মতো পাহাড়। সেই পথে আমরা যাতায়াত করি।

একদিন সকালে উঠে আমি কাজে বেরিয়ে গিয়েছি, মুসো কুলিরাও জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেছে। পিছনে আছে খালি আমার চাকর শশী, একজন দোভাষী, আর শঙ্কর ও মঙ্গল নামে দুজন খালাসী।

মঙ্গলের সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। মঙ্গল তাই চটে, "যাই সাহেবের কাছে রিপোর্ট করি" বলে চলে গেছে। তখন দোভাষী ভাবল যে তাড়াতাড়ি গিয়ে মঙ্গলের সঙ্গে ভাব করতে হবে, কি জানি যদি সত্যি রিপোর্ট করে বসে। বিদ্ঘুটে রাস্তা, পা হড়কালেই একশো দেড়শো ফুট নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে। দোভাষী ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করে পথের উপর চোখ রেখে চলেছে, আবার ক্ষণে-ক্ষণে মুখ তুলে দেখছে মঙ্গলকে দেখা যায় কিনা।

মঙ্গলের আবার তামাক খাবার রোগ। পথ চলতে-চলতে ক্রমাগত তাকে কলকে হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হয়। দোভাষী একবার মুখ তুলে দেখতে পেল যে একটু সামনেই বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে লালপানা একটা দেখা যাচ্ছে মঙ্গলের মাথায় লাল পাগড়ি। তাহলে নিশ্চয়ই মঙ্গল ওখানে বসে তামাক সাজছে। দোভাষী তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, আর মাথা নিচু করেই বলতে লাগল, "হ্যাঁ ভাই মঙ্গল, এটা কি ভালো হল? এক জায়গায় দশ-পাঁচটা হাঁড়ি থাকলে একটু আধটু ঠোকাঠুকি হয়ই, তাই বলে কি কথায়-কথায় ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে আছে?" বলতে-বলতে সে বাঁশঝাড়ের সামনে এসে পড়েছে আর মুখ তুলেই দেখে—বাবা গো, কোথায় মঙ্গল? এ যে প্রকাণ্ড বাঘ ওঁৎ পেতে রয়েছে, আর দোভাষীর দিকে চেয়ে চেয়ে লেজ ঘুরোচ্ছে।

দোভাষী তাড়াতাড়ি তার ছোট তলোয়ারখানার মুখ বাঘের দিকে ধরে নিয়ে দাঁড়াল, যদি বাঘটা লাফিয়ে পড়ে।

বাঘটাও উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মাঝখানে বাঁশঝাড়, তাই আর লাফাবার সুবিধা পাচ্ছে না। দোভাষী ভাবছে শশী আর শঙ্কর তার পিছনে; শশী এখুনি বন্দুক চালাবে, কিন্তু শশী যে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে তা কি আর সে জানে! শেষে যখন একটুখানি মুখ ফিরিয়ে দেখে বুঝল যে পিছনে কেউ নেই, তখন সে চিৎকার করে উঠল। চিৎকার কি সহজে বের হতে চায়? ভয়ে বেচারার গলা শুকিয়ে গেছে। যাই হোক, একটা গলাভাঙা গোছের আওয়াজ শশীর কানে পেঁছিল, আর তখুনি তারা "ভয় নেই, ভয় নেই" বলে ছুটে এল। বাঘটাও তাই দেখে থতমত খেয়ে 'হুপ্' বলে লাফ দিয়ে ছুটে পালাল! দোভাষী তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, ঘামে তার গায়ের কাপড় সমস্ত ভিজে গেছে, কথা বলতে পারছে না। অনেক কষ্টে বললে, "বাঘ"!"

এর পর আর সে কখনো একলা পথ চলত না।

এই শান ষ্টেট থেকে আমি দুটো বাঘের চামড়া এনেছিলাম। এই বাঘ-মারার ইতিহাসটি বেশ। একজন লোক বনে হরিণ মারতে গিয়েছিল। একটা হরিণের পায়ের দাগ ধরে তাকে খুঁজে বের করে সে গুলি করতে গেল, কিন্তু বন্দুকে আর আওয়াজ হল না, যাকে বলে মিস্ ফায়ার হওয়া। ঘোড়া তুলে আবার মারতে গেল, এবারও আওয়াজ হল না। লোকটা ভাবল বুঝি ক্যাপটাই খারাপ, ট্যাকে আরও ক্যাপ ছিল, তার একটা বের করতে গেল। কোঁচড় থেকে ক্যাপ বের করতে গিয়ে মুখ ফিরিয়েই দেখে তার পিছনেই প্রকাণ্ড এক বাঘ, সাত-আট ফুট দূরেও নয়। এই তাকে ধরে আর কি! তখন সে ভয়ের চোটে সেই খারাপ ক্যাপসুদ্ধই বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপে দিল, আর কি আশ্চর্য। গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল, সঙ্গে-সঙ্গে বাঘের মগজও উড়ে গেল। ভগবান যাকে রক্ষা করেন, বাঘও তাকে মারতে পারে না।

অন্য বাঘটাকে মেরেছিল একটি বারো বছরের ছেলে। দুপুর বেলা মুসোদের গ্রামের মেয়ে-পুরুষরা সকলে ক্ষেতে কাজ করতে গেছে, গ্রামে আছে কেবল ছেলেপিলের দল। সে-দেশের ঘর হয় মাচার উপর, উপরে মানুষরা থাকে আর নিচে থাকে তাদের পোষা জন্তু-জানোয়ার। দিনের বেলাতেই একটা বাঘ একজনের ঘরের নিচে ঢুকে একটা শুয়োর ধরেছে, আর শুয়োরটা চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলেছে।

সেই ঘরে ছিল ঐ বারো বছরের ছেলেটি, আর তার বাবার গুলিভরা বন্দুক। সে আস্তে-আস্তে উঠে, মাচার বাঁশের ফাঁক দিয়ে এক গুলিতেই বাঘ মশাইয়ের শুয়োর খাবার শখ মিটিয়ে দিল। তারপর গ্রামসুদ্ধ লোক মজা করে ঐ বাঘের মাংস খেল।

হিজি বিজ্ বিজ্

সুকুমার রায়

এক ছিল রাজা। রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওমরা সিপাই শান্ত্রী গিজ গিজ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে, সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর বসে ঘাড় নিচু করে চারদিকে তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললে, "কঃ"। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ একসঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ করে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটি ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই করে রাজার মাথার উপর পড়ে গেল। রাজামশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢলে এসেছিল, হঠাৎ তিনি জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক"। বলতেই জল্লাদ এসে হাজির, রাজা মশাই বললেন, "মাথা কেটে ফেল।"

সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে; সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। রাজামশাই খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই, মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোর করে বললে, "আজ্ঞে মহারাজ কার মাথা?" রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে! যে এই রকম বিটকেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিঃশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে সেখান থেকে উড়ে পালাল। মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন, "ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল।"

তখন রাজামশাই বললেন, "ডাকো পণ্ডিত-সভায় যত পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজামশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ করে গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পারেন?"

কাক আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি! পণ্ডিতরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিল, "আজ্ঞে, বোধ হয় তার ক্ষিদে পেয়েছিল।"

রাজামশাই বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! ক্ষিদে পেয়েছিল তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি-মুড়কি বিক্রি হয়। মন্ত্রী, ওকে বিদায় করে দাও—" সকলে মহা তম্বী করে বললে, "হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক, ওকে বিদায় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবেন মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবেন প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয় কোন কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য্য এই যে তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের ঐ রকম দুর্দশা দেখে, সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায় কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজামশাই দস্তুর মতো ক্ষেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত, কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে।" রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে লাল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের ক্ষিদে বাড়তে লাগল—রাজা মশাইয়ের ক্ষিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা" বলে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা সুটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চিৎকার করে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা-মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র, উজির-নাজির, সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি হলো, কি হলো?"

তখন অনেক জলের ছিটা, পাখার বাতাস আর বলা-কওয়ার পর, লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বললে, "মহারাজ, সেটা কি দাঁড়কাক ছিল?" সকলে বললে "হাঁ-হাঁ হাঁ, কেন বল দেখি? লোকটা আবার বললে, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ

দিকে মুখ করে বসেছিল—আর মাথা নিচু করে ছিল, আর চোখ পাকিয়ে ছিল, আর 'কঃ' করে শব্দ করেছিল ?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দাওনি কেন ?"

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তোমরা তখন খবর দাওনি কেন ?" লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সেকথা বলতে সাহস পেলে না, সবাই বললে, "হাঁ, ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কি খবর দেবে, একথা কেউই বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত করে বললে, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি ! সবাই ভাবল, লোকটা ক্ষেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দিঘাঞ্চু কি হে ?" লোকটা বললে, "দিঘাঞ্চু নয় দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বললে, "ও !" তখন রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে ?" লোকটা বললে, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি অত খবর রাখি না, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি—দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের ওপরে বসে মাথা নিচু করে দক্ষিণ দিকে মুখ করে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' বলে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি কিছু জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয়নি বলে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কি ?"

লোকটা বললে, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে বলে ফেল।" সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বললে, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি, দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম, তা হলে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোন বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব ?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বল তো।"

লোকটা বললে, "সর্বনাশ ! সে-মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া, কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দুদিন উপোস করে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে তাকে আপনি

মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোক শুনে ফেলে, তা হলেই সর্বনাশ!"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা, আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজামশাই দুদিন উপোস করে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হলদে সবুজ ওরাংওটাং
ইটপাটকেল চিৎপটাং।
মুস্কিল আসান উড়ে মালী
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজামশায় গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই, লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন অন্য কোনরকম আশ্চর্য কিছু হয় কিনা! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোন সন্ধান পাননি।

স্বর্ণডাইনীর গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের একালে ডাইনী নাই।···একালের ছেলেরা ডাইনী-ডাকিনীর কথা শুনলে হেসে উঠবে। কিন্তু সে আমলে আমাদের অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যেত এদের নামে।

আমাদের গ্রামে আমাদেরই বাড়ির পূর্বপ্রান্তে বড় একটা পুকুর, বড় বড় তাল গাছে ঘেরা। তার উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনীর ঘর, একেবারে গ্রামের প্রান্তে। একপাশে জেলে পাড়া, অন্যপাশে বাউরী পাড়া—মাঝখানে খানিকটা খালি জায়গায় একটা অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছতলায় ছোট একখানি ঘর। তারপর, অর্থাৎ স্বর্ণের বাড়ির পর পূর্বদিকে আর বসতি নাই, প্রান্তর চলে গিয়েছে। বালি আর কালচে মাটির প্রান্তর।···

স্বর্ণ ডাইনী। আমাদের দেশের ভাষায় 'স্বনা ডান।'

স্বর্ণ তরিতরকারি বেচে বেড়াত। এই ছিল তার জীবিকা। তিন চার ক্রোশ দূরের হাট থেকে কিনে আনত, বেচত আশেপাশের গ্রামে। পান, কাঁচকলা, পাকা রম্ভা, শাক, কুমড়ো এই সব। আমাদের গ্রামে সে বেচত না। আশেপাশের গ্রামেই বেচত। গ্রামের কারও বাড়িতে সে ঢুকতে চাইত না। কি জানি কার অনিষ্ট করে বসবে। তার ভিতর যে-লোভটা আছে, সে যখন লক-লক করে জিভ বার করবে, তখন তো স্বর্ণের বারণ শুনবে না!···ওর ভিতরের ডাইনীটা তো ওর অধীন নয়! সেই তো ওর জীবনের মালিক, তারই হুকুমে ওকে চলতে হয়। তার হুকুম ছাড়া ওর মরবারও অধিকার নেই। তার ভিতরের ডাইনীটা—সে এক সিদ্ধ বিদ্যা, তাকে কোনো নূতন মানুষকে না দেওয়া পর্যন্ত স্বর্ণ মরবে না।

স্বর্ণের মাসী কি কে যেন ছিল ডাইনী। মৃত্যুকালে আত্মীয়-স্বজনদের খবর পাঠিয়েছিল, কিন্তু কেউ যায় নি! ভয়ে যায় নি, যদি কৌশলে তাকে দিয়ে যায় ঐ সর্বনাশা ভয়ঙ্কর বিদ্যা!—সে যে ডাইনী হয়ে যাবে!

মৃত্যুর পর স্বর্ণ গেল। নিশ্চিন্ত হয়েই গেল! বিদ্যা সে তো কাউকে দিয়ে দিয়েছে। নইলে মরণ হল কেমন করে। গিয়ে দেখলে তখন মাসীর অনেক অনেক আত্মীয় এসেছে। আত্মীয়রা যা ছিল ভাগ করে নিয়েছে। সকলে চলে গেল। বিধবা স্বর্ণ বসে রইল দাওয়ার উপর। তার যেমন অদৃষ্ট! হঠাৎ 'ম্যাও ম্যাও' শব্দ করে মাসীর পোষা বিড়ালটা তার পা ঘেঁষে বসল। ওটাকেই কেউ নিয়ে যায় নি। বিড়ালটা তার পায়ে গা ঘষলে, গর-গর শব্দ করলে!···যেন বললে—'আমাকে তুমি নিয়ে চলো।'···

স্বর্ণের মায়া হল। নিয়ে এল বেড়ালটা। মাছ-ভাত-দুধ খাওয়ায়, কোলের কাছে নিয়ে শোয়। পাশের জেলেপাড়ায় যায়, বাউরী পাড়ায় যায়।

সেদিন হই-চই উঠলো জেলেপাড়ায়। জেলেদের একটা কচি ছেলের কি হয়েছে, ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে আর কাঁদছে—কাঁদছে বেড়ালের মতো আওয়াজ করে। 'এ্যাঁ—ও'। অবিকল বেড়ালের শব্দ।

গুণীন এলো। গুণীন দেখে বললে, 'ডাইনীর কাজ। কিন্তু—'

—কিন্তু কি?

—ডাইনটা মনে হচ্ছে···

বলতে হল না শেষটা। স্বর্ণের বেড়ালটা ছুটে এল উঠোনে, রোঁয়া ফুলিয়ে 'এ্যাঁ-ও শব্দ করে থাবা পেতে বসল।

—এই, এই তো বেড়ালটা, এইটাই ডাইন।

—বেড়াল ডাইন?

—হ্যাঁ। কোনো ডাইন মরবার সময় ওকে দিয়ে গেছে ডাইনী-বিদ্যে।

—ঠিক কথা। স্বর্ণে মাসী ছিল ডাইনী। বেড়াল তো তারই। কি সর্বনাশ!

একটা জোয়ান জেলের ছেলে দুরন্ত ক্রোধে বসিয়ে দিলে এই লাঠি তার মাথার উপর। মাথাটা প্রায় চুর হয়ে গেল। কিন্তু তবু মরল না, লেজ আছড়াতে লাগল।···

গুণীন বললো, 'সাবধান। কেউ কাছে যাবে না। ও এখন ডাইনমন্ত্রটি দেবার চেষ্টা করবে। নইলে ওর মৃত্যু হবে না!'

সে মন্ত্র পড়লে, নিজের অঙ্গবন্ধন করলে—তারপর সন্তর্পণে লেজ ধরে বের করে ফেলে দিয়ে এল গ্রামের প্রান্তে।

স্বর্ণ ঘরে বসে সভয়ে কেঁপে উঠল। লোকে তাকে গাল দিয়ে গেল। কেন এনেছিল সে ওই পাপকে।

সন্ধ্যের মুখে ক'টি ছেলে পথ দিয়ে গেল। তারা বলে গেল, বেড়ালটা এখনো মরে নি। ইঃ, কি গোঙাচ্ছে! বাপরে!'···

স্বর্ণ গেল চুপি চুপি। না দেখে থাকতে পারলে না। সাদা দুধের মত বেড়ালটার রঙ রক্তে-ধুলোয় পিঙ্গল হয়ে গেছে। কি যন্ত্রণা-কাতর শব্দ!

স্বর্ণ এগিয়ে গেল দু-পা, এক-পা করে। তাকে স্পর্শ করলে। বেড়ালটা মরে গেল।

স্বর্ণের একি হল! স্বর্ণের চোখে একি দৃষ্টি, একি হল তার?···তার জিভ সরস হয়ে উঠেছে। কল-কল করে উঠছে। এ কি হল তার!

··· ··· ···

এমনি করে নাকি স্বর্ণ হয়েছিল ডাইনী।

সে আবার কাউকে ডাইনী বিদ্যে দেবে—তবে তার মরণ হবে। নইলে ওই মাথা-ভাঙা বেড়ালটার মতো কাতরাবে, কাতরাবে, কাতরাবে—তবু তার মৃত্যু হবে না। মৃত্যু চোখের সামনে বসে থাকবে।

ও বলবে—'আমাকে নাও গো, আমাকে নাও।'

মৃত্যু বলবে—'কি করে নেব? এই বিদ্যে তুই আগে কাউকে দে, তবে নেব। নইলে তো পারব না।'

স্বর্ণের হাত নাই তার ভিতরের ডাইনীর উপর। সে কি গ্রামের কারুর বাড়ি যেতে পারে? বাপরে!...

স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান, তরকারি নিয়ে আসতো। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন 'ঠাকুরঝি'। ওই-টুকুতেই সে কৃতার্থ। স্বর্ণ আসত এরপর আমাদের বাড়ি। আমার ভয় চলে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে বসে আছে। নিঃসঙ্গ, পৃথিবী-পরিত্যক্ত স্বর্ণ। চুপ করে বসে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত।

আমার বিশ-বাইশ বছর বয়স যখন হল, তখন আমি তার বেদনা বুঝলাম। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেও সে বিশ্বাস করতো—সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ করে সে মনে মনে শিউরে উঠতো। কাউকে চোখে ভালো লাগলে চোখ বন্ধ করতো। তার আশঙ্কা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে। হয়তো বা খেয়ে ফেলেছে বলে শিউরেও উঠতো।...

বড় হওয়ার দায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলার আরেকটা গল্প বলি। শৈশবকালে নয়, কিশোর বয়সের। বাবা তখন টাঙ্গাইলে, ময়মনসিং জেলার একটা মহকুমা শহরে।...

তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেবারে বর্ষার পর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসায় ক'দিন স্কুল যাওয়া বন্ধ, ঘুরে বেড়ানো বন্ধ, কানে একটানা চলছে কুইনিনের ভোঁ ভোঁ! কী করা যায়? কালীপুজো আসছে, বাজীই বানানো যাক।

একটা মোটা বেঁটে শিশিতে বারুদ রেখে বারান্দায় উবু হয়ে বসে পটকা বানাবার জন্য ব্যবস্থাগুলি সারছি। কাছে ঘেঁষে বসে আছে ছোটো দুটি ভাই।...

আমি এদিকে একমনে ন্যাকড়ার ফালি, পাথরের কুঁচি ঠিক করছি; ওদিকে লালু করেছে কি, শিশি থেকে একটু বারুদ শিশিটার কাছেই ঢেলে ফস্ করে দেশলাই জ্বালিয়ে দেখতে গেছে জ্বলে কি না!

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজে শিশিটার বিস্ফোরণ এবং ছররাগুলির মতই টুকরো টুকরো কাচের আমাদের তিন ভাইয়ের অঙ্গে প্রবেশ। রক্তে বারান্দা ভেসে যাওয়া।

ঠিক সেই সময়ে বাবা কোথা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তা থেকেই শিশি ফাটার শব্দ আর বাড়ির লোকের চিৎকার শুনে 'আমার সর্বনাশ হলো রে' বলতে বলতে ছুটে ভিতরে এলেন এবং একজনকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে আমাদের রক্তপাত ঠেকাবার চেষ্টা করতে লেগে গেলেন।

প্রত্যেকের শরীরে আট দশটা করে গভীর ফুটো হয়েছে, সহজে কি রক্ত বন্ধ হয়! অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য আমরা খুব কাবু হয়ে পড়েছিলাম। সবচেয়ে বেশী কাবু হয়েছিল ছোট ভাইটি।

তিন ভাই কি জন্য সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম জানো? উবু হয়ে বসার জন্য। ওভাবে বসায় পেট আর বুক ছিল পায়ের আড়ালে, হাত আর পায়েই তাই কাচ ঢুকেছিল বেশী।

তারপর ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তিন জনে বিছানা নিলাম। পরদিন কাচ বার করার পালা।

সরু ফুটো করে কাচ শরীরে ঢুকেছে। শলা ঢুকিয়ে আগে ঠিক হবে কাচের টুকরোর অবস্থান, তারপর মাংস কেটে মুখ বড়ো করে বার করতে হবে।

ডাক্তারবাবু আমায় বললেন, 'তুমি বড়ো, প্রথমে তোমায় ধরবো। একটা কথা মনে

রাখতে হবে! তুমি বারুদ বানিয়েছ, বোকার মতো কাচের শিশিতে বারুদ রেখেছ। তোমার জন্যে ছোট ভাই দুটির এত কষ্ট। কাচ বার করবার সময় তুমি যদি বেশী চেঁচামেচি কাঁদাকাটা করো, ওরা দুজন ভয় পেয়ে ভড়কে যাবে। তুমি বড়ো, ব্যথা লাগলেও চেঁচাবে না। বুঝতে পারছো?' সোজা কথাটা না বুঝে উপায় কি। অগত্যা দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে চোখ বুজলাম। ক্ষতের মধ্যে শলা ঢুকিয়ে ডাক্তার যখন আস্তে আস্তে ভিতরে নেড়ে কাচ কোথায় আছে খোঁজেন, কাচ বার করার জন্য ছুরি কাঁচি চালান, তখন একটু চেঁচাবার অধিকার না থাকা যে কি ব্যাপার, সেদিন খুব ভাল করেই টের পেয়েছিলাম।

টুকরো অবশ্য বার করা গিয়েছিল সহজেই, তবু সময় লেগেছিল অনেকক্ষণ। শেষ ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে ডাক্তার বাবাকে বলেছিলেন, 'এ তো আশ্চর্য ছেলে, একটু শব্দ করলো না!'

ডাক্তার বা আত্মীয়স্বজন বোঝে নি ব্যাপারটা, তাই তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। বীরত্ব বা অসাধারণ সহ্যশক্তির কোনো পরিচয়ই আমি সেদিন দিই নি। আমি চোখ বুজেছিলাম কেন জানো? আহত রক্তমাখা ভাই দুটির চেহারা, যন্ত্রণায় বিকৃত-কাতর তাদের মুখ মনের চোখের সামনে রাখার জন্য! আমি কেন, ভাই দুটি ভয় পাবে, ভড়কে যাবে জেনে ওই অবস্থায় কেউ চেঁচাতে পারে না।

আমের কুসি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালবেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে। এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু, ও অপু—সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্ক মিশ্রিত।

অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কিরে? দুর্গার হাতে একটা নারিকেল মালা। সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আমকাটা। স্বর নিচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু মাথা নাড়িয়া বলিল—উঁহু।

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস্? আমের কুসি জরাবো···

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে! আমার কাপড় যে বাসি!

তুই যা না শিগ্গির করে, আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েছে—শিগ্গির যা—তেলটেল যেন মেজেতে ঢালিসনে।

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, বলিল—নে, হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলো বুঝি হোল? আচ্ছা, নে আর দুখানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েছে রে—একটা লঙ্কা আনতে পারিস্?

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার উপর রেখে দ্যায়। আমি যে নাগাল পাইনে!

—তবে থাকগে যাক—

খিড়কির দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শোনা গেল—দুগ্গা, ও দুগ্গা—

মায়ের ডাক কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জরানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি

গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই।…দুর্গা খালি মালাটা একটান মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল, ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যালো না বাঁদর—নুন লেগে রয়েছে যে! পরে দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? অতবড় মেয়ে সংসারের কুটো কাজটা ভেঙে দুখানা করা নেই কেবল পাড়ায় টো-টো করে টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল?

অপু আসিয়া বলিল—মা খিদে পেয়েচে।

—তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিনই ফাইফরমাজ। ও দুগ্‌গা, দ্যাখতো বাছুরটা ডাক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরেব দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শশা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আর এট্টু আঠা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত-স্বরে বলিল—চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—আম কোথায় পেলি?…সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিষণ্নমুখে বলিল—ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি এইতো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—যখন ডাকলে তখন তো—। স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুইতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা, ডেকে ডেকে সারা হোল!

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ-দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে। আর কোনদিন আম দেবো, না ছাই দেবো!—হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে?…

দাওয়াই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কেষ্টগোপালবাবুকে লোকে বলে কাষ্ঠগোপাল।

অকারণে বলে না একটা মিষ্টি কথা বলবারও অভ্যাস নেই ভদ্রলোকের। কারণে অকারণে লোককে যা-তা বলে তাদের মন খারাপ করে দিতে তিনি ভয়ানক ভালবাসেন।

এই ধরো, পটলা অঙ্কে ফেল করে ক্লাসে প্রমোশন পেল না। তিন দিন ধরে ছেলেটা খালি কেঁদেছে, তাকে দেখলে সকলেরই দুঃখ হয়, কেবল কাষ্ঠগোপালের হয় না! পটলাকে আরও কষ্ট দিয়ে মনে মনে তিনি ভারী আরাম পান। বাজারের ভেতর দিয়ে হয়তো পটলা যাচ্ছে, চারিদিকে লোকজন, তার মধ্যে গলা চড়িয়ে কাষ্ঠগোপল বললেন, কিরে পটলা, অঙ্কে নাকি তুই তিন পেয়েছিস?

পটলা যে দৌড়ে পালাবে তারও জো নেই। রাস্তা জুড়ে কাষ্ঠগোপাল দাঁড়িয়ে। অত লোকের সামনে ডুকরে কেঁদে ওঠবার উপায়ও নেই পটলার। লাভের মধ্যে যারা খবরটা জানত না তারাও জেনে গেল। মিট মিট করে হাসতে লাগলেন কাষ্ঠগোপাল।

বিশ্বনিন্দুকে লোক। কিছু পছন্দ হয় না কাষ্ঠগোপালের। পাড়ায় কোনো বাড়ীতে বিয়ে-টিয়ে হলে ভদ্রতার খাতিরেও তাকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। আর খেতে বসে কী করেন কাষ্ঠগোপাল—আরে ছ্যা, এর নাম লুচি। এ যে জুতোর চামড়া হে! পচা ভেজিটেবিল ঘি জোটালে কোত্থেকে? রাম-রাম, এ রকম বাজে মাছের কালিয়া তো কখনও খাইনি। অ্যাঁ! এগুলো রসগোল্লা নাকি? তাহলে আর সুজির পিণ্ডি কাকে বলে?

কেউ যদি বলে, আমাদের তো ভালোই লাগছে—কাষ্ঠগোপাল তাকে ঠাট্টা করতে থাকেন। বলেন, পরের পয়সায় যে খাচ্ছ হে! জুতোর সুখতলাও অমৃতির মতো মনে হবে, মার্বেল খেতে দিলেও বলবে জনাইয়ের মনোহরা খাচ্ছি।

এই হলেন কাষ্ঠগোপাল। কিন্তু লোকে তাঁকে চটাতে সাহস পায় না। তাঁর অনেক টাকা, আর পাড়ার অর্ধেক বাড়ীর তিনি মালিক।

পাড়ায় নতুন বাড়ী করে এসেছেন মার্তণ্ডবাবু। রাশভারী চেহারার লোক। কী যেন সরকারী চাকরী করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন। প্রায়ই বই-টই পড়েন আর সকালে বিকালে একটা লাঠি হাতে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যান।

কাষ্ঠগোপাল গিয়ে হাজির হলেন তাঁর কাছে। নতুন লোক, আলাপ তো করা চাই। তা ছাড়া ফাঁক পেলে দুটো কড়া কথাও বলে আসবেন।

মার্ত্তণ্ডবাবু একটা মস্ত চামড়া-বাঁধানো ডেকচেয়ারে বসে একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। কাষ্ঠগোপালকে দেখে বইটা নামিয়ে বললেন, আসুন, বসুন।

—আলাপ করতে এলুম।

চশমার ভেতর দিয়ে তাঁকে ভালো করে দেখে নিলেন মার্ত্তণ্ড, তারপর বললেন, বেশ।

একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, এ পাড়ায় বাড়ী করলেন কেন?

—এমনি। ভালো লাগল।

—না মশাই, অতি নচ্ছার পাড়া। লোকগুলো খুব বাজে।

—তাই নাকি? আপনিও বুঝি খুব বাজে!

কথাটা শুনে একটা বিষম খেলেন কাষ্ঠগোপাল ঃ না—না—ইয়ে—আমি বাজে লোক নই। পাড়ায় একমাত্র ভালো লোক আমাকেই বলতে পারেন।

মার্ত্তণ্ড বললেন—শুনে সুখী হলুম। তা, কী খাবেন? চা, না ঘোলের সরবৎ?

কাষ্ঠগোপাল বললেন—বড্ড গরম পড়েছে আজ। ঘোলের সরবৎই ভালো!

মার্ত্তণ্ড ঘোলের সরবৎ আনতে বলে দিলেন চাকরকে। কাষ্ঠগোপাল ভাবতে লাগলেন, এইবারে কী বলা যায়।

—অনেক খরচ করে বাড়ী করলেন মশাই কিন্তু ভালো হয়নি।

মার্ত্তণ্ড বললেন, ভালো হয়নি বুঝি? সবাই তো প্রশংসা করছে বাড়ীর।

—ও তো মুখের প্রশংসা মশাই। এ আবার বাড়ীর একটা ডিজাইন নাকি? তা ছাড়া সব বাজে বাজে মাল-মসলা দিয়ে তৈরী মশাই, দেখবেন—এক বছরেই ফাট ধরে যাবে।

—ফাট ধরে যাবে?

—যাবেই তো। কনট্রাক্টাররা কী করে? যেমন তেমন করে কেবল পয়সা আদায়ের ফন্দী। যা-তা একটা তৈরী করে দিলেই হল।

—অ। মার্ত্তণ্ড আবার কাষ্ঠগোপালের দিকে তাকালেন ঃ কিন্তু এ বাড়ী তো কনট্রাকটারে করেনি। আমার বড় ছেলে এন্‌জিনীয়র, সেই-ই দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছে।

কিন্তু আপনি যাই বলুন ডিজাইনটা ভাল হয়নি। কপাল কুঁচকে মার্ত্তণ্ড কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন কাষ্ঠগোপালের দিকে।

আর এর মধ্যে চাকর ঘোলের সরবৎ নিয়ে এল।

চমৎকার সরবৎ। মসলা-টসলা দিয়ে অনেক যত্ন করে তৈরী—নিন্দে করবার কিছু নেই। কিন্তু এক চুমুক খেয়েই নাক কুঁচকে উঠল কাষ্ঠগোপালের।

মার্ত্তণ্ড বললেন—সরবৎ আপনার পছন্দ হয়নি বোধ হয়।

কাষ্ঠগোপাল বললেন, সত্যি কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না—পছন্দ হয়নি।

মার্তণ্ড শান্ত গলায় বললেন, কি রকম আপনার পছন্দ ?

—এ দই দোকান থেকে আনিয়েছেন তো ?

—আর কোথায় পাব ?

—তাই। আরে দোকানের দই কি আর দই মশাই, ও তো অর্ধেক চুনের গোলা।

বিনীত হয়ে মার্তণ্ড বললেন। তাহলে ভালো দই কোথায় পাব বলতে পারেন ?

—বলছি, শুনুন। খুশি হয়ে কাষ্ঠগোপাল টেবিলে একটা চড় মারলেন ঃ সে-দই, সে-ঘোল খেয়েছিলুম আমার পিসিমার বাড়ীতে—হরিপাল-তারকেশ্বর লাইনে যে হরিপাল আছে সেখানে।

মার্তণ্ড বললেন—বলে যান।

—আগের দিন গোরু দোয়ানো হল। সেই টাটকা দুধ ক্ষীরের মতো জাল দিয়ে সন্ধ্যেয় দই পাতা হল। সেই দই থেকে পরদিন দুপুরে যখন ঘোল তৈরী হল—

বাধাদিয়ে মার্তণ্ড বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আমিই সেই ঘোল খাওয়াতে পারি আপনাকে। একেবারে সেই জিনিস ? একেবারে কোন খুঁত পাবেন না। বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মার্তণ্ড। কাষ্ঠগোপালকে বললেন,—আসুন আমার সঙ্গে।

কাষ্ঠগোপাল কেমন চমকে গেলেন।

—কোথায় যেতে হবে ?

—আসুন, বলছি।

বাপরে, কি গলার আওয়াজ মার্তণ্ডের ! পিলে চমকে গেল কাষ্ঠগোপালের।

মার্তণ্ড আবার সেই বাঘাস্বরে বললেন,—আসুন, শিগগির।

অগত্যা উঠে পড়লেন কাষ্ঠগোপাল। তাকে সোজা দোতলায় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট ঘরের দরজা খুলে দিলেন মার্তণ্ড। বললেন,—ঢুকুন ওর মধ্যে।

—অ্যাঁ। ওখানে কি ?

—ঘোলের সরবৎ। আপনি যেমন চেয়েছেন। ঢুকুন।

প্রায় ঠেলেই কাষ্ঠগোপালকে ভেতরে ঢোকালেন মার্তণ্ড। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

বাজের মতো আওয়াজ তুলে মার্তণ্ড বললেন—আমার স্পেশাল সরবৎকেও আপনি নিন্দা করলেন। ঠিক আছে, আপনি যা চান, তাই খাওয়াব।

—কিন্তু এ ঘরে সরবৎ কোথায় মশাই ? মিস্তিরিদের কটা চুনের টিন, ক'টা বাঁশ—

—আসবে, সরবৎ আসবে। আমি এখন হাটে লোক পাঠাচ্ছি, সন্ধ্যের মধ্যে সে লোক ফিরে আসবে। কাল দুধ দোয়ানো হলে, দই পাতা হবে। সেই দই থেকে

পরশ্ব দ্বপ্বরে ঘোল হবে। সেই ঘোল খেয়ে, তবে আপনি এ ঘর থেকে বের্বেন, তার আগে নয়।

মার্তণ্ড চলে গেলেন। কাতরস্বরে চেঁচাতে লাগলেন কাষ্ঠগোপালবাব্, কেউ সাড়া দিল না।

ভাগ্যিস, ঘরে ছোট জানালাটার শিক-টিক কিছ্ব ছিল না। প্রাণের দায়ে সেইটে দিয়ে ঝাঁপ মারলেন কাষ্ঠগোপাল—পড়লেন একটা পচা ডোবার ভেতরে। ঘোলের বদলে একপেট কাদাজল খেয়ে তিনি উঠে পড়লেন, তারপর সেই যে ছ্বটলেন···

অলিম্পিকের দৌড়ও তার কাছে লাগে না।

কাঁপুনি শিখতে হবে

সুখলতা রাও

একজন লোকের দুই ছেলে। বড় ছেলে হারু, সে খুব চালাক। আর ছোট ছেলে কানু, সে বড় বোকা। কাজেই বাড়ির যত কাজকর্ম বড় ছেলেকেই সব করতে হয়; কিন্তু রাত্রিবেলায় কোথাও যেতে হলে তার ভারি ভয় করে। আর ভূতের গল্প শুনলে বলে, "বাবারে! ভয়ে আমার কাঁপুনি আসছে!" তাই শুনে ছোট ছেলে কানু ভাবে তাই তো! কাঁপুনি কাকে বলে তা তো জানি না। সেটা কি রকম জিনিস?

একদিন কানুর বাবা তাকে ডেকে বললেন, "দেখ, তুই এত বড় হলি, এখনও কিছু কাজ শিখলি না। এর পরে খাবি কি করে? তোর দাদা দেখতো কত কাজ করে।"

কানু বলল, "আমি একটা জিনিস শিখব ঠিক করেছি। কাঁপুনি কাকে বলে বাবা? সেইটা শিখতে আমার ভারি ইচ্ছা।"

"তার জন্য ভাবনা নেই, সে তুই আপনিই শিখবি। কিন্তু তাতে কি আর পেট ভরবে?" বললেন কানুর বাবা।

পরদিন গুরুঠাকুর এসেছেন আর তাদের বাবা তাঁর কাছে দুঃখ করছেন যে কানু কিছু কাজ শিখল না, কেবল বলে 'কাঁপুনি কি? কাঁপুনি শিখব।' একথা শুনে গুরু বলনে, "আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিও, আমি তাকে আচ্ছা করে কাঁপুনি শিখিয়ে দেব।

কানু গুরুঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের বাড়ি গেল। সেখানে তার কাজ হল রোজ মন্দিরের সিঁড়ি ঝাঁট নেওয়া। একদিন দুপুর রাত্রে উঠে গুরু বললেন, "কানু, কাল খুব সকাল সকাল পুজো করতে হবে, তুমি এখনি গিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি ঝাঁট দিয়ে

এসো।” কানু সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছে, ঝাঁট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ; এমন সময়ে সে চেয়ে দেখে, সকলের উপরের সিঁড়িতে একটা সাদা মতন কি দাঁড়িয়ে আছে। সে ভাবল, বুঝি চোর! নইলে এত রাত্রিতে এ এখানে কি করতে এসেছে? তারপর সে চীৎকার করে বলল, “কে এখানে? শীগ্‌গির পালাও, না হলে এক ঠেলা মেরে ফেলে দেব।” সেই সাদা জিনিসটা কিন্তু কিছু বলল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন কানু ছুটে গিয়ে তাকে এমন ধাক্কা দিল যে সেটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গেল। তাতে কানু খুব খুশী হয়ে ঝাঁটপাট শেষ করে বাড়ি এসে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগল। পরদিন সকলবেলা সকলে এসে দেখে যে, মন্দিরের সিঁড়ির নিচে গুরুঠাকুর সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। তা দেখে তারা ভারি আশ্চর্য আর ব্যস্ত হয়ে ধরাধরি করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেল। তারপর তাঁর গায়ের বেদনা সারতে অনেক দিন লেগেছিল। এ সব কথা শুনে কানুর বাবা তাকে বললেন, “তুই দূর হয়ে যা। আমি আর তোর মুখ দেখব না।”

কাজেই কানু আর কি করে, সে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সে পথ দিয়ে যায় আর বলে, ‘কাঁপুনি শিখতে হবে’, ‘কাঁপুনি শিখতে হবে’। এমনি করে যেতে যেতে সে আর-এক রাজার দেশে চলে গিয়েছে। সেখানে একদিন একজন তাকে বলল, “কাঁপুনি শিখতে চাও? কি করলে কাঁপুনি শেখা যায় আমি বলে দিতে পারি। ঐ যে পাহাড়ের উপর বাড়ি দেখছ, ওটা ভুতের বাড়ি। ওখানে অনেক টাকাকড়ি আছে, ভুতেরা সে সব পাহারা দেয়। আমাদের রাজা বলেছেন, যে-লোক ওখানে এক রাত্রি থাকতে পারবে, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। তুমি ঐ ভুতের বাড়িতে এক রাত থাকলে কাঁপুনিও শিখতে পারবে, রাজার মেয়েও বিয়ে করতে পারবে।”

কানু তখনই গিয়ে রাজামশাইকে বলল, “রাজামশাই, আমি এক রাত ঐ ভুতের বাড়িতে থাকব।” শুনে রাজা বললেন, “বাঃ, বেশ কথা! তিনটি জিনিস তুমি সঙ্গে নিতে পার। তা তুমি কি চাও?”

কানু চাইল আগুন জ্বলাবার জন্য কিছু কাঠ, একটা বসবার চৌকি আর একটা বড় ছুরি।

রাজামশাই তখুনি অনেক কাঠ, একটা চৌকি, আর একটা মস্ত বড় ছুরি ভুতের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ালেন।

তারপর সন্ধ্যা হতেই কানু একলা একলা সেখানে গেল। তখন শীতকাল ছিল, তাই সে কাঠ দিয়ে আগুন জেবলে, ছুরি হাতে নিয়ে, আগুনের ধারে চৌকি পেতে বসে রইল। অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর তার মনে হল যেন চারিদিকে কিসের একটা গোলমাল চলছে; নাকিসুরে কারা যেন বলছে, “উঁ-হুঁ-হুঁ, ভাঁরি শীঁত। ভাঁরি শীঁত!

কানু তখন চেঁচিয়ে তাদের বলল, "তোরা তো ভারি বোকা রে! দূর থেকে খালি ভীঁরি শীঁত, ভীঁরি শীঁত করছিস্। শীত করে তো আগুনের ধারে এসে বস্ না।" অমনি চারিদিক থেকে ধুপ্ধাপ্ করে, এই বড় বড় কালো কালো কুকুর বেড়াল লাফিয়ে পড়তে লাগল। তারা সব ভুত। তাদের চোখগুলো সব আগুনের মত জ্বলছে, লাল লাল জিভ সব লক্লক্ করছে। তারা এসে কানুকে ঘিরে আগুনের চারিধারে বসল, আর তার দিকে চেয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। কানু কিন্তু তাতে একটুও ভয় পেল না। খানিক পরে ভুতগুলো তাকে বলল, "আঁয় নাঁ খেঁলা কঁরি।" কানু বলল "আগে তোদের নখ দেখি তো!" তারা তাদের কালো কালো থাবা এগিয়ে দিয়ে দেখাল, তাতে এই বড় বড় বাঘের নখের মত নখ। তাই দেখে কানু বলল, "তোদের যে নখ, খেলতে গিয়ে যদি আঁচড়ে দিস্? আয়, আগে নখগুলো কেটে দি।" বলে যেই সে ছুরি বার করে তাদের নখ কাটতে গিয়েছে, অমনি সব কুকুর, বেড়াল কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। তারা কিনা ভুত! যে ভয় পায়, তাকে তারা মেরে ফেলে, যে ভয় পায় না তার কিছু করতে পারে না।

এতক্ষণে কানুর ভারি ঘুম পেয়েছে। সেই ঘরের এক কোণে একটা মস্ত বড় খাটে সুন্দর বিছানা করা ছিল। কানু সেটা দেখতে পেয়েই, ভারি খুশী হয়ে বিছনায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর সবে তার চোখ বুজে এসেছে, অমনি তার মনে হল যেন খাটখানা একটু একটু নড়ছে। দেখতে দেখতে খাটখানা ঠক্ঠক্ করে নড়ে উঠল, তারপর দোলনার মত দোল খেয়ে খেয়ে শেষে একেবারে লাফাতেই লাগল। কানু কিন্তু তবু ওঠে না; সে বিছানা বালিশ শক্ত করে আঁকড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। লাফাতে লাফাতে শেষটায় খাট তাকে নিয়ে দিল ছুট্। সিঁড়ি বেয়ে, উঠোন পেরিয়ে, ঘরের ভিতর দিয়ে সমস্ত বাড়িময় খাটটা বেড়াতে লাগল, খট্খট্ খট্খট্ হড়হড় ঘড়ঘড় শব্দে কানে তালা লেগে গেল! তখনও কিন্তু কানু বিছানায় শুয়ে আছে। তারপর হঠাৎ খাটটা উল্টে গিয়ে তোষক বিছানা বালিশ সবসুদ্ধ কানুকে হুড়মুড় করে মাটিতে ফেলে দিয়ে, চুপ করে দাঁড়াল। কানু তখন আস্তে আস্তে উঠে ভাবল যে আর তো ঘুম হবে না; যাই আগুনের কাছে গিয়েই বসি।

কিন্তু সেখানে গিয়ে সে দেখল যে, তার চৌকির উপরে একটা মস্ত দাড়িওয়ালা লোক বসে আছে। কানু তাকে বলল, "ওটা আমার চৌকি, তুই ওখান থেকে ওঠ, ওখানে আমি বসব।" দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, "বটে, তোর চৌকি! দেখি তো তোর গায়ে কত জোর, আমাকে চৌকি থেকে ওঠা দেখি?" যেই এই কথা বলা, অমনি এক ঠেলা দিয়ে কানু তাকে চৌকি থেকে ফেলে দিল। তখন দুজনে এমন কুস্তি লেগে গেল যে কি বলব! অনেকক্ষণ কুস্তির পর সেই দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, "আর না ভাই, ঢের

হয়েছে। তোর গায়ে তো খুব জোর, আর তোর খুব সাহসও আছে দেখছি। আমি এই বাড়ির ভূতদের সর্দার। এখানে যে সব টাকা-কড়ি আছে সে সব এতদিন আমরা পাহারা দিতাম। এখন সে টাকাকড়ি তোর।" এই বলে সে কানুকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাল, সে ঘরভরা কত সোনা রূপো মণি মুক্তা ঝক্‌ঝক্ করছে।

পরদিন সকাল হতেই রাজামশাই অনেক লোকজন নিয়ে ভূতের বাড়িতে গেলেন। তাঁরা মনে করেছেন ভূতেরা নিশ্চয় কানুকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন যে সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তা দেখে রাজামশাই যেমন আশ্চর্য হলেন, কানুর কাছে সব কথা শুনে তেমনি খুশীও হলেন। তারপর তাকে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে নিজের বাড়িতে এনে, খুব ধুমধাম করে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

রাজার বাড়িতে কানু মহা সুখে আছে, কিন্তু তার এখনও ভারি দুঃখ এই যে কাঁপুনি শিখতে পারল না। রাত্রে ঘুমের ভিতরও কানু বলে, "তাই তো, কাঁপুনি শিখতে পারলাম না। কাঁপুনি শিখতে হবে।"

একথা শুনে শুনে, একদিন রাজার মেয়ে করলেন কি, তার ঝিকে বললেন, "ঝি, নদী থেকে কতকগুলো ছোট ছোট মাছ ধরে নিয়ে আয় তো ; এনে মাছগুলোকে এক কলসী ঠাণ্ডা জলে রেখে দে।"

সেটা শীতকাল। রাত্রে যখন কানু ঘুমিয়ে, তখন সেই মাছভরা ঠাণ্ডা জলের কলসী নিয়ে রাজার মেয়ে তার গায়ে ঢেলে দিলেন। ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে ছোট ছোট মাছগুলো কিলবিল করে তার গায়ে পড়তেই, এমনি শীত আর কাঁপুনি তাকে ধরল যে কাঁপুনি যাকে বলে!

সে ধড়ফড়িয়ে লাফিয়ে উঠে খালি হু-হু-হু-হু, হি-হি-হি করে কাঁপছে আর বলছে, "আরে আরে আরে, একি! এই বুঝি কাঁপুনি?" তারপরে সে খুব হাততালি দিয়ে "কাঁপুনি শিখেছি, কাঁপুনি শিখেছি" বলে নাচতে লাগল।

নোবেল পুরস্কার

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

১৯১৩ সালের অক্টোবরে কবি বিলাত থেকে ফিরেছেন—আছেন 'শান্তিনিকেতনে' বাড়ির দোতলায়। এখনো তাঁর উত্তরায়ণের পর্ণকুটির নির্মিত হয়নি, রবীন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকার নির্মাণ-কল্পনাও জাগেনি। পূজাবকাশে বিদ্যালয় বন্ধ—খুলতে দেরি আছে। আশ্রমে ফিরে কবির মন বেশ প্রসন্ন। কলকাতায় যে-দুদিন ছিলেন, নানা সাংসারিক কারণে ক্লান্ত হয়ে ওঠেন—তাই এখানে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন—"কত আরাম সে আর বলতে পারিনে!" চারদিক নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা আজ আর কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে 'গানের উৎসটা খুলে গেছে।' লিখলেন অনেক কয়েকটা গান যা প্রায়ই শুনি। মন প্রকৃতির মধ্যে ও গানের মধ্যে এমনই মশগুল হয়ে আছে যে সেই সময় দার্জিলিং যাবার কথা উঠলে, তা কবি নাকচ করে দেন।

পূজাবকাশের পর আশ্রম-বিদ্যালয় খুলল ৯ই নভেম্বর। আমরা এসে গেছি—ছাত্ররাও জুটেছে। কয়েকদিন পরে কবির 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির খবর এলো।

সে তো আজ থেকে ষাট বছর আগেকার কথা—সেই পুরনো দিনের কিছু কথা তোমাদের বলছি। সেদিন ভারতের—এই বাংলাদেশের এক কবি পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের দরবারে বিশ্বকবির আসন পেলেন। ১৯১৩ সালের ১১ নভেম্বর সুইডেনের ষ্টকহলম থেকে ঘোষিত হল যে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ইংরেজী গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।'

মনে পড়ছে সেদিনের কথা। শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে খাওয়ার আয়োজন হয়েছে—

এখন অবশ্য সে-রান্নাঘরের চিহ্নও নেই। পিঁড়িতে সবাই বসেছে, এমন সময় কবির জামাতা নগেন গাঙ্গুলী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলেন—'গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।' যারা নোবেলের কথা জানত, তারা পুরস্কারের ব্যাপারটা বুঝতে পারল। অধিকাংশই জানত না—তারা জিজ্ঞাসু নয়নে চেয়ে রইল। সে সময়ে তো শান্তিনিকেতনে আছে কেবল স্কুলের ছাত্ররা—কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তো তখনো হয়নি। তাই, স্কুলের ছেলেদের কাছে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে হল নোবেল পুরস্কারের মানে কি। বললাম—'নোবেল সুইডেনবাসী বিজ্ঞানী ও শিল্পপতি। তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করে বহু অর্থ অর্জন করেন। তখন ডিনামাইটের ব্যবহার হত পাথর ভাঙতে। যে কাজ মানুষকে সাবল, গাঁইতি দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে করতে হত—ডিনামাইট বিস্ফোরণের সাহায্যে তা সহজে, সুলভে করা সম্ভব হল। এই বিস্ফোরণ আবিষ্কার করে তিনি নাকি বলেছিলেন—'এর ভীষণতা দেখে আশা করি মানুষ যুদ্ধ করতে চাইবে না।' কিন্তু আজ ডিনামাইটের চেয়ে সহস্রগুণ ধ্বংসকারী অ্যাটম বোমা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করে রেখেছে। নোবেল ছিলেন শান্তিবাদী। তাই মানুষের কল্যাণের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যায় যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের জন্যও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে দেন। আর সাহিত্যে যাঁরা মানবের মধ্যে মৈত্রীভাবনার কথা প্রচার করবেন তাঁরাও পাবেন এই পুরস্কার এবং বিশ্বশান্তির জন্য যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টা করবেন তাঁরা এই পুরস্কার লাভ করবেন। এই জন্যে তিনি বহু কোটি টাকা তহবিলে রেখে যান। প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ষাট বৎসর আগে যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সে সময় শান্তির জন্য সম্মান পান আমেরিকার Elihu Root (1845—1931) এবং Henri Lafontine (1854—1943). Elihu Root ছিলেন মার্কিন আইনজীবী। আন্তর্জাতিক—বিশেষ করে মার্কিন ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। নোবেল পুরস্কার পাবার পরও বিশ্বশান্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। দ্বিতীয় প্রাপক Lafontine ছিলেন বেলজিয়ান—ইনিও আইনজীবী। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার একনিষ্ঠ সমর্থক। হেগের (Hague) আন্তর্জাতিক শান্তি পরিষদের স্থায়ী সভাপতি।

মনে আছে কলকাতা থেকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এল ১৫ই নভেম্বর। ১৩ই সান্ধ্য দৈনিক 'এম্পায়ার' কাগজে প্রথম সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সেকালে তো আর রেডিও ছিল না যে মুহূর্তে দেশ-বিদেশে খবর ছড়িয়ে পড়বে। বিদেশ থেকে খবর আসত কেবল টেলিগ্রামে।

কবি তখন যাচ্ছিলেন চৌপাহারি জঙ্গল দেখতে—বোলপুর—ইলামবাজারের পথ গিয়েছে সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দ্বিপুবাবুর নূতন মোটর গাড়ি করে চলেছেন কবি। গাড়িতে অনেকেই আছেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি, ১৯১৩ সালে মোটর গাড়ি এদেশে কমই ছিল—এ জেলাতে তো ছিলই না। যাহোক, যাবার পথে পোষ্ট অফিসে সদ্যপ্রাপ্ত টেলিগ্রাম কবিকে দেওয়া হল। শান্তিনিকেতনে তখন টেলিগ্রাফ অফিস ছিল না—ডাকঘরই খুলেছে বৎসর দুই মাত্র। মোটর গাড়ি ফিরে এলে নগেন গাঙ্গুলি এসে রান্নাঘরে ঘোষণা করলেন খবরটা, সে কথা তো আগেই বলেছি।

ছেলেরা খবরটা শুনে সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়ের কাছে গিয়ে ছুটি চাইল। সেটা মঞ্জুর হওয়ায় তারা খুশী হয়ে জগদানন্দ বাবুকে একটা নরবড়ে খাটে উঠিয়ে আশ্রম প্রদক্ষিণ করতে লাগল। তিনি চেঁচাচ্ছেন—'আরে পড়ে মরবো—নামা, নামা!' কে শোনে! আশ্রম প্রদক্ষিণ করা হল। সে কি উৎসাহ!

পরদিন থেকে টেলিগ্রাম আসতে শুরু করল নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের নেপালবাবুকে ডেকে বললেন—'এবার আপনাদের পাকা ড্রেন ও পাকা পায়খানা হবে।'

কবি আছেন 'শান্তিনিকেতনের' দোতলার ঘরে। এত উত্তেজনার মধ্যেও গানের সুরে মন ভরপুর। লিখে চলেছেন গানের পর গান।

যাদুকর

লীলা মজুমদার

সকালে খুব দেরী করে উঠলাম। উঠেই গায়ের চাদরটা এক লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তারই উপর দাঁড়ালাম। চটি খুঁজে পেলাম না। খালি পায়ে স্নানের ঘরে গেলাম। দাঁত মাজলাম না, তাতে যে সময়টুকু বাঁচল সে সময়টা কলের মুখ টিপে ধরে পিচকিরির মতন দেয়ালে-টেয়ালে জল ছিটোলাম। খানিকটা আবার বাবার তোয়ালের উপরও পড়ল দেখলাম। তারপর চোখেমুখে জল দিয়ে, মুখহাত মুছে সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ঘরের কোণায় ছুঁড়ে মারলাম। তারপর একমুখ জল ভরে নিয়ে, শোবার ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে নিচে রাস্তায় একজন বুড়ো লোকের গায়ে পুচ্-চ্ করে ফেলেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে চুলটাকে খুব যত্ন করে আঁচড়াতে লাগলাম।

ততক্ষণে নিচের তলায় মহা সোরগোল লেগে গেছে। পিসিমা দুধের বাটি নিয়ে বলছেন, 'ঘোতন কোথায় ?' মা আমার চটিজোড়া নিয়ে বলছেন, 'ঘোতন কোথায় ?' আর সব থেকে বিরক্তি লাগল শুনে যে মাষ্টারমশাইও সেই সঙ্গে ম্যাও ধরেছেন, 'প্রশান্তকুমার কি আজ পড়বে না ?' ভীষণ রাগ হল। জীবনে কি আমার কোনও শান্তি নেই ? এই সকালবেলা থেকে সবাই মিলে পিছু নিয়েছে।

পিসিমাকে সিঁড়ির ওপর থেকে ডেকে বললাম, 'দুধ খাব না।' সিঁড়ির নিচে মাকে এসে বললাম, 'চটি পরা ছেড়ে দিয়েছি।' বসবার ঘরে গিয়ে গলা নিচু করে মাষ্টারমশাইকে বললাম, 'মা বলে দিয়েছেন, আজ আমার পেটব্যথা হয়েছে, আজ আমি পড়ব না।' তারপর একেবারে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, সারাটা সকাল রোয়াকে রোদ্দুরে বসে-বসে পা দোলালাম, আর রাস্তা দিয়ে যত ছ্যাকরা গাড়ি গেল তার গাড়োয়ানদের ভ্যাংচালাম। দশটা বাজতেই উঠে গিয়ে বই-টই কতক গুছিয়ে, আর

কতক-কতক খ‍ুঁজেই পাওয়া গেল না বলে ফেলে রেখে, ঝুপ-ঝুপ করে একটু স্নান করে নিয়ে খ‍ুব যত্ন করে চুলটা ফের আঁচড়ে নিয়ে খাবার ঘরে গেলাম।

মা জলের গেলাস দিতে দিতে বললেন, 'হ‍্যাঁরে, মাষ্টারমশাই কখন গেলেন, শ‍ুনতে পেলাম না তো?'

আমি সত্যি করেই বললাম, 'সে ক-খ-ন চলে গেছে কেবা তার খবর রাখে!'

ভাত কতক খেলাম, কতক চারপাশে ছড়ালাম, কতক প‍ুসিকে দিলাম, আর কতক পাতে পড়ে রইল। মাছটা খেলাম, ডাল খেলাম, আর ঝিঙে-বেগ‍ুন ইত্যাদি রাবিশ-গ‍ুলো সব ফেলে দিলাম। মা রান্নাঘর থেকে দেখতেও পেলেন না। ট্রামভাড়াটা পকেটে নিয়ে মাকে বললাম, 'মা, যাচ্ছি।' এই পর্যন্ত প্রায় রোজই যেমন হয় তেমনই হল। অবিশ্যি মাষ্টারমশায়ের ব্যাপারটা রোজ হয় না, তাই যদি হতো তাহলে বাবাটাবাকে বলে মাষ্টারমশাই এক মহাকাণ্ড বাধাতেন সন্দেহ নেই।

কিন্ত‍ু এরপর থেকে সেদিন সব যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গেল। মনে আছে ট্রামে উঠে ডান দিকের একটা কোণা দেখে আরাম করে বসলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আর খালি মনে হচ্ছে কে যেন আমাকে দেখছে। একবার ট্রামসুদ্ধ সবাইকে দেখে নিলাম, ব‍ুঝতে পারলাম না কে! তারপর আবার যেই বাইরে চোখ ফিরিয়েছি আবার যেন মনে হল কে আমাকে এমন করে দেখছে যে আমার খ‍ুলি ভেদ করে ব্রেন পর্যন্ত দেখে ফেলছে। তাইতো! আমার ভারি ভাবনা হল। এমনিতেই নানান আপদ, তার উপর আবার ব্রেনের ভিতরকার কথাগ‍ুলো জেনে ফেললে তো আর রক্ষে নেই। কিছ‍ুতেই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আবার মাথা ঘ‍ুরিয়ে ট্রামের প্রত্যেকটি লোককে ভাল করে দেখলাম।

এবার লক্ষ্য করলাম ঠিক আমার সামনে কালো পোশাক পরা একটি অদ্ভুত লোক। তার ম‍ুখটা তিনকোণা মতন, মাথায় গাধার টুপির মতন কালো টুপি, গায়ের কালো পোশাকে লাল-নীল-হলদে-সব‍ুজ চক‍্রাবক‍্রা তারা-চাঁদ আঁকা, পায়ে শ‍ুঁড়ওয়ালা কালো জ‍ুতো, দ‍ুই হাঁটুর মাঝে হাতে ঝুলছে একটা সন্দেহজনক কালো থলে।

এরকম লোক সচরাচর দেখা যায় না। অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই ভীষণ চমকে উঠলাম। দেখলাম মাথায় টুপি নয়, চুলটাই কিরকম উঁচু হয়ে বাগিয়ে আছে। গায়ে সাধারণ ধ‍ুতির উপর কালো আলোয়ান, তাতে ট্রামের ছাদের কাছের রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে রঙবেরঙ হয়ে আলো পড়েছে। আর পায়ে নাকতোলা বিদ্যাসাগরী চটি। খালি হাতের থলিটা সেইরকমই আছে। কিরকম একটু ভয়-ভয় করতে লাগল।

লোকটা খ‍ুশি হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'অতই যদি খারাপ লাগে, ইস্কুলে যাও কেন? বড়রা যখন এতই অব‍ুঝ তাদের কথা মেনে নাও কেন?'

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে কি করব ?'

লোকটি বলল, 'কি করবে ? তাকিয়ে দেখ নীল আকাশে ছোট-ছোট সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছেরা সব ভিজে পাতায় সোনালী রঙের রোদ মেখে বসে আছে। গড়ের মাঠের ধার ঘেঁষে পুকুরটাকে দেখ, ঘোর সবুজ জলে টলমল করছে। আর, টের পাচ্ছ দখিণ হাওয়া দিচ্ছে ?' তারপর লোকটা তার বড়-বড় ফুটোওয়ালা নাকটা তুলে বাতাসে কি যেন শুঁকে বলল, 'হুঁ' পেঙ্গুইনের গন্ধ পাচ্ছি। গড়ের মাঠের ওপারে, গঙ্গার ওপারে, বঙ্গোপসাগরের ওপারে, ভারতমহাসাগরের ওপারে, কোন একটা বরফজমা দ্বীপের ওপর সারি-সারি পেঙ্গুইন চলাফেরা করছে, তাদের মুখেচোখে রোদ এসে পড়েছে, ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে, দু-একটা সাদা নরম পালক উড়ে গিয়ে এখানে-ওখানে পড়ছে—দেখতে পাচ্ছ না ?'

কি আর বলব তখন, আমি যেন স্পষ্ট ঐ সব দেখতে পেলাম, আর আমার সমস্ত মনটা আনচান করে উঠল। মনে হল এমন দিনে কি কেউ ইস্কুলে যায় ? এমন পৃথিবীতে কোন দিনও কেউ ইস্কুলে যায় ? আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আরেকটু আস্তে-আস্তে বলল, 'জান ভোর ভোর রাতে বড়-বড় চিংড়িমাছ ধরতে হয়, তার এক-একটার ওজন এক সেরের বেশি। দুদিন ধরে সমুদ্রের নীচে দড়ি বাঁধা সব হাঁড়ার মতন ডুবিয়ে রাখতে হয়। আর ভোরবেলা গিয়ে ঐ দড়ি ধরে টেনে হাঁড়াসুদ্ধ চিংড়ি তুলতে হয়। তারপর বাড়ি ফেরবার সময় আস্তে-আস্তে সকাল হয়। তুমি তো জান যে পূবদিকে সূর্য ওঠে, কিন্তু একথা জান কি যে পশ্চিম দিকের আকাশটা আগে লাল হয়, তার পর পূবদিকে সূর্য ওঠে ? তারও পর পশ্চিমদিকের লাল রঙ মিলিয়ে যায়, আর সমস্ত আকাশটা পোড়া ছাইয়ের মতন হয়ে যায়। তারাগুলোকে নিবে যেতে কখনো দেখেছ কি ?'

আমার মনে হল আমার নিশ্চয় এখানে কিছু বলা উচিত, কিন্তু আমার জিব দেখলাম শুকিয়ে কাঠের মতন হয়ে গেছে। কিছু আর বলা হল না। খালি মনটা হু-হু করতে লাগল। সে লোকটা আমার দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কি জন্য কলকাতায় পড়ে থাক আর ইস্কুলে যাও ? জান রবিঠাকুর ইস্কুল পালিয়ে-পালিয়ে অত বড় কবি হয়েছিলেন। আর জান, সাঁওতাল পরগণায় যখন মহুয়া গাছের ফল পাকে, তার গন্ধে জঙ্গলসুদ্ধ সব জিনিসে নেশা লেগে যায়। অর বনের ভাল্লুকগুলো মহুয়া খেয়ে-খেয়ে নেশায় বেহুঁশ হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকে। পরদিন সকালে কাঠুরেরা তাদের ঐ রকম ভাবে দেখতে পায়। তুমি জানতে যে মহুয়া ফল খেলে নেশায় ধরে ?'

আমার তখন মনে হলো দিনের-পর-দিন ইস্কুলে গিয়ে আমি বৃথাই জীবন নষ্ট করছি। ঐ লোকটা নিশ্চয় কখনও ইস্কুলেই যায়নি।

হঠাৎ দেখি সে উঠে দাঁড়িয়েছে, আমার দিকে ফিরে অম্লান বদনে বলল, 'এসো'। এমন করে বলল যেন বহুক্ষণ থেকে ঐ রকম কথা ছিল। ও-ও নামবে আর সেই সঙ্গে আমিও নামব। আমি নামলাম। যদিও আমি জানতাম অচেনা লোক ডাকলে সঙ্গে যেতে নেই। যদিও দিনের-পর-দিন পিসিমা বলেছেন—দুষ্টু লোকেরা বলে, 'মণ্ডা খাবি?' 'সার্কাস দেখবি?' এই সব বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে হয় আসামের চা-বাগানে চালান দেয়, নয় ঘোর জঙ্গলে ম-কালীর কাছে ঘ্যাঁচ করে বলি দেয়।

তবুও আমি নামলাম। কারণ রোজ-রোজ ঐ ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, পড়া তৈরী করা, স্নান করে ভাত খাওয়া, ইস্কুলে যাওয়া, ইস্কুল থেকে সারাটা দিনমান নষ্ট করে বিকেলে আবার বাড়ি ফেরা, সেই খাওয়া, সেই শোয়া—ঐ রকম দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর—যতদিন না অনিশ্চিত ভবিষ্যতে, কবে আমি বড় হয়ে ভালো চাকরি করে এই সব জিনিসের ভালো ফল দেখাব—ও আর আমার সহ্য হচ্ছিল না।

বইগুলো ট্রামের কোণায় আমার জায়গায় পড়ে রইল। আমি সেই লোকটার সঙ্গে নেমে গেলাম। তখন মোড়ের ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজেছে। সে আমাকে একটা চায়ের দোকানের ভিতর দিয়ে পিছন দিকের ছোট একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে আমাকে একটা টিনের চেয়ারে বসিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। একটু পরেই সে আবার ফিরে এল, সঙ্গে একটা একচোখা লোক, অন্য চোখটার গায়ে একটা সবুজ তাপ্পি মারা। একটা পা আছে, আরেকটা পা কাঠের তৈরি।

এই লোকটা আমার দিকে একচোখ দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'কি হে ছোকরা, পড়াশুনোর উপর নাকি এমনই ঘেন্না ধরে গেছে যে একেবারে সে-সব ত্যাগ করে এসেছ?' তার গলাটা এমন কর্কশ আর চেহারাটাও এমন বিশ্রী যে আমি সত্যি ভারি ভড়কে গেলাম।

কালো কাপড় পরা লোকটার দিকে তাকাতেই সে গ্রামোফোনের চাকতির মতো বলে যেতে লাগল, 'পড়াশুনো করে কি হবে? জান আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে যেসব বিরাট-বিরাট নদী আছে তার ধারে-ধারে কুমীরেরা আর হিপ্পোপটেমাসরা শুয়ে-শুয়ে দিন কাটায় আর লম্বা লাল ঠ্যাং-এ ভর দিয়ে গোলাপী রঙের ফ্ল্যামিঙ্গো পাখিরা রোদ পোয়ায়? আর ঐ সব জঙ্গলের মধ্যে এমন বিশাল-বিশাল অরকিড জাতের ফুল ফোটে

যে তার মধ্যে একটা মানুষ দিব্যি আরামে শুয়ে থাকতে পারে!' বুঝতে পারছিলাম এ লোকটা যাদু জানে। কারণ তক্ষুণি আমার ভয়টয় উড়ে গেল। অন্য লোকটাকে জোর গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, সে-সব চিরদিনের মতো ত্যাগ করে এসেছি।' লোকটা হাসল, বলল, 'চিরদিন বড়ো দীর্ঘকাল হে ছোকরা। চিরদিনের কথা কে বলতে পারে? কিন্তু তোমার সাহস আছে, উৎসাহ আছে, তুমি অনেক কিছু করতে পারবে। স্বাস্থ্যটাও তো ভাল দেখছি। আশা করি বাড়ির জন্য মনের টান ইত্যাদি কোন দুর্বলতা নেই?' হঠাৎ মনে হল মা এতক্ষণে স্নানের যোগাড় করেছেন, বাবা আপিস গেছেন এবং দুজনেই মনে মনে ভাবছেন আমি বুঝি ইস্কুলে গেছি। গলার কাছটা সবে একটু ব্যথা করতে শুরু করেছিল এমন সময় কালো কাপড় পরা লোকটা বলল, 'ইস্কুলের বাইরে, বাড়ির বাইরে, কলকাতা থেকে বহুদূরে নরওয়ের উত্তরে চাঁদ্নি রাতে হারপুন দিয়ে তিমি শিকার হয়। তিমির গায়ে হারপুন বিঁধলে তিমি এমনি ল্যাজ আছড়ায় যে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে যায়। কত নৌকা ডুবে যায়। আবার তিমি মরে গিয়ে যখন উলটে গিয়ে ভেসে ওঠে, দেখবে তার বুকের রঙটা পিঠের চেয়ে ফিকে। আর জান, ইংল্যাণ্ডে শীতকালে সোয়ালো পাখিরা থাকে না। তারা দলে-দলে উড়ে স্পেনে চলে যায়, আর যেই শীত কমে আসে আবার তারা দলে-দলে সমুদ্রের উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত গতিতে উড়ে ফিরে আসে। এসে দেখে তাদের আগেই শীতের বাতাসকে তুচ্ছ করে ড্যাফোডিল ফুলরা ফুটে গেছে।' আমার মন পাখির মত উড়ে যেতে চাচ্ছিল।

একচোখা বলল, 'কিন্তু শুধু তিমি মারলে হবে না। তার বহু অসুবিধাও আছে, বহু দূরও। এই কাছাকাছি মানুষটানুষ মারতে পারবে? পরে যাবে আফ্রিকা, নরওয়ে, আলাস্কা। আপাতত অন্ধকার রাত্রে গলির মুখে দাঁড়িয়ে বাঁকা ছুরি হাতে নিয়ে ঘচ্ করে সেটাকে লোকের বুকে আমূল বসিয়ে দিতে পারবে? যেমন রক্তের নদী ছুটবে তুমিও হো-হো করে রাত কাঁপিয়ে কাষ্ঠ-হাসি হেসে উঠবে? মাথায় বাঁধা থাকবে লাল রুমাল?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সেই কালো কাপড় পরা লোকটা বলল, 'উত্তর মেরুতে সীল মাছেরা বরফের মধ্যে বাস করে—'

আমি বললাম, 'কুড়ি বছর পরে উত্তর-মেরুর কথা শুনব, এখন আমি ইস্কুলেই বরং যাই, মাথায় আমি লাল রুমাল কিছুতেই বাঁধতে পারব না।'

লোকটা বলল, 'কে জানে ভুল করছ কিনা?'

আমি ততক্ষণে চায়ের দোকানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে ট্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি।

প্রথম যে ট্রাম এল তাতেই উঠে পড়লাম। উঠেই ভীষণ চমকে গেলাম। দেখলাম ট্রামের কোণায় ডানদিকের সিটে আমার বইগুলো পড়ে রয়েছে। কেমন করে হল বুঝতে না পেরে, ফুটপাথে চায়ের দোকানের সামনে কালো কাপড় পরা লোকটার দিকে তাকালাম।

আবার মনে হল তার মাথায় গাধার টুপির মত টুপি, গায়ের কালো পোশাকে রঙ-বেরঙের চক্‌রাবক্‌রা আঁকা ; আর পায়ে শুঁড় তোলা কালো যাদুকরের জুতো।

সে আমাকে হাত তুলে ইশারা করে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। আর আমি মোড়ের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তখনও সাড়ে দশটা বেজে রয়েছে।

কালুসর্দার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তোমরা বোধ হয় জান, তিনশ বছর আগে এই বাংলাদেশ একেবারে অরাজক ছিল। তখন মুসলমান-রাজত্ব যায় যায়, অথচ বৃটিশ রাজত্বের পত্তন হয়নি। তখন সত্যিই এদেশ হয়েছিল মগের মুল্লুক।

জমিদারমশাই হয়তো কাছারিতে বসে আছেন, এমন সময় বিশাল যমদূতের মত চেহারা নিয়ে একজন সেখানে এসে হাজির। জমিদারের তো তাকে দেখেই চক্ষুস্থির হয়ে গেছে! কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন—"কি চাই বাপু, তোমার?"

ভীমসেনের যমজ-ভাই কায়দা-দুরস্তভাবে লম্বা কুর্ণিশ করে জলদগম্ভীরস্বরে বললেন—"সর্দার আপনাকে সেলাম দিয়েছেন হুজুর।" তারপর মালকোঁচামারা কাপড়ের ট্যাঁক থেকে এক চিঠি বেরুল।

চিঠিতে জমিদারের শ্রীচরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে লেখা হয়েছে যে, অমুক দিনে অমুক সময়ে জমিদারমশায়ের একান্ত শ্রীচরণাশ্রিত ভৃত্য বাবলাডাঙ্গার কালুসর্দার শ'খানেক বাছা-বাছা লাঠিয়াল নিয়ে হুজুরকে সেলাম দিতে আসবে। হুজুর যেন তাদের বকশিষের বন্দোবস্ত করে রাখেন।

জমিদারমশাই চিঠি পড়ে পাখার হাওয়া খেতে খেতেও ঘেমে উঠলেন। বুড়ো নায়েবমশাই তো মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়! এমন যে জমিদারমশাইয়ের লম্বা-চওড়া ভোজপুরী দারোয়ান, সে পর্যন্ত পেতল-বাঁধন লাঠিটা ফেলে কোথায় যে গেল, তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। খানিক বাদে একটু সামলে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই ডাকলেন—"রায়মশায়!"

তক্তপোষের তলা থেকে জবাব এল—"আজ্ঞে।"

নায়েবমশাইকে তক্তপোষের তলায় দেখে সবাই তো অবাক! মাকড়সার জাল-টাল মেখে তিনি বেরিয়ে আসতে জমিদারমশাই চটে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি ওখানে কি করছিলেন ?"

নায়েবমশাইয়ের উপস্থিত-বুদ্ধি কিন্তু খুব বেশী, অম্লানবদনে তিনি জবাব দিলেন —"আজ্ঞে, একটা দলিল পড়ে গেছল, তাই খুঁজছিলাম।"

আমাদের জমিদারমশাই বড় কেও-কেটা নন। একটা আস্ত পরগণা তাঁর দখলে, গড়ের মত তাঁর বাড়ি, পাইক-বরকন্দাজ লাঠিয়াল তাঁরও বড় কম নয়। কিন্তু তবুও তাঁকে কালুসর্দারের ভয়ে অস্থির দেখে সেকালের ডাকাতদের প্রতাপ বোধহয় কিছু বোঝা যায়।

নায়েবের পর জমিদার পরামর্শ করবার জন্যে ডাকতে পাঠালেন তাঁর বড় ছেলে ধনঞ্জয়কে।

কিন্তু পাইক খানিক খুঁজে এসে খবর দিলে—"তিনি নেই হুজুর।"

জমিদারমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"নেই কিরে? দেখ্‌গে যা আখড়ায় গিয়ে হয়ত লাঠি চালাচ্ছে। ব্যাটার ওই তো কাজ, চাষা হয়ে কেন যে জন্মায়নি তাই ভাবি।"

"আজ্ঞে, তিনি সকালে বাহান্ন-গ্রাম গেছেন!"

"হ্যাঁরে সঙ্গে কারা গেছে ?"

"আজ্ঞে, সঙ্গে তিনি কাউকেও যেতে দেননি।"

এবার জমিদারমশাইয়ের মুখ দিয়ে আর কথাও বেরুল না। খানিক বাদে নায়েব-মশাইকে শুধু তিনি হতাশভাবে বললেন—"মঙ্গলবার সিংদরজা খোলাই থাকবে। তাদের যেন কেউ বাধা না দেয়।"

গভীর জঙ্গলের ভেতর ডাকতদের আড্ডা। নামে বাবলাডাঙ্গা হলেও বাবলা ছাড়া বোধহয় সব গাছই সেখানে আছে এবং সে-সব গাছের ঝোপ এত ঘন যে, দিনের বেলাতেও সেখানে অন্ধকার হয়ে থাকে।

তিন-চারজন লোক মিলে নতুন গোটাকতক 'রণ্‌পা' তৈরি করছে, কালুসর্দার বসে বসে তাই তদারক করছিল, এমন সময় কাছেই জঙ্গলের ভেতর ভয়ানক হট্টগোল শোনা গেল। হট্টগোল নয়, মনে হল, বেশ একটা যেন দাঙ্গা চলেছে।

কালুসর্দারের শাসন একেবারে বজ্রের মত কঠোর। তার দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে, এ-তো সম্ভব নয়। হট্টগোল অত্যন্ত বেড়ে ওঠাতে কালুসর্দারকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার সন্ধান নিতে যেতেই হল।

কিন্তু কয়েক-পা এগুতেই যে-দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তাতে কালুসর্দারকে পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

কুড়ি-একুশ বছরের একটি গৌরবর্ণ যুবক কালুসর্দারের দলের একজন সেরা লাঠিয়ালের সঙ্গে লড়ছে—না, শুধু লড়ছে বললে তার কিছুই বলা হয় না ; কায়দার পর কায়দায় বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে যেন ছেলেখেলা করছে।

কালুসর্দার মনে মনে এরকম ওস্তাদ খেলোয়াড়কে তারিফ না করে পারল না। দেখতে দেখতে ছেলেটির লাঠির একঘায়ে কালুসর্দারের দলের লাঠিয়ালের হাত থেকে লাঠি খসে পড়ল। তখন দলের অনেক লোক তাদের চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এত লোকের সামনে অপমানে ও লজ্জায় লোকটা রাগে অন্ধ হয়ে পাশের এক জনের হাত থেকে একটা বল্লম নিয়ে ছুঁড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কালুসর্দার সামনে এগিয়ে এসে বললে "খবরদার!" তারপর লোকটার হাত থেকে বল্লমটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—"লজ্জা করে না, এইটুকু ছেলের কাছে লাঠি ধরতে না পেরে আবার বল্লম ছোঁড়া!" তারপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সর্দার জিজ্ঞেস করলে—"তোমার নাম কি ভাই?"

কালুসর্দারের বিশাল সিংহের মত বলিষ্ঠ চেহারার ওপর ছেলেটি দুবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—"তাতে তোমার দরকার?"

দলের সবাই তো অবাক! কালুসর্দারের মুখের ওপর এরকম জবাব! কিন্তু কালুসর্দার একটু হেসে বললে—"তা ঠিক বলেছ, তোমার নামে কোন দরকার নেই, তোমার পরিচয় তোমার হাতের লাঠিই দিয়েছে, তুমি আমাদের দলে আসবে?"

খানিক চুপ করে থেকে একটু হেসে ছেলেটি বললে—"যদি না আসি।"

কালুসর্দার তেমনি হেসে ধীরে ধীরে বললে—"আমাদের গোপন আড্ডা দেখবার পর আমাদের দলের না হলে জ্যান্ত যে কেউ ফিরতে পারবে না ভাই। তুমি এপথে এসে ভালো করনি।"

ডাকাতের দলের সংখ্যা দেখে মনে মনে কি ভেবে ছেলেটি বললে—'বহুৎ আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি মরবার সাধ আমার নেই, আজ থেকে আমি তোমাদের।"

কালুসর্দার এবার একটু হেসে বললে—"তোমার নাম তো তুমি বললে না, কিন্তু তোমায় ডাকা হবে তাহলে কি বলে?"

ছেলেটি একটু চিন্তা করে বললে—"ধর, আমার নাম ফ্যালারাম।"

দুদিনের মধ্যে ডাকাতের দলে ফ্যালারামের খাতির আর ধরে না। যে কাজে দাও, ফ্যালারামের জুড়ি মেলা ভার। লাঠি খেলতে, বল্লম ছুঁড়তে 'রণ্‌পায়ে' দৌড়তে, লাঠিতে ভর দিয়ে লাফ দিতে ফ্যালারামের সমান ডাকাতদের ভেতর খুব কমই আছে

দেখা গেল। কালুসর্দার পর্যন্ত একদিন বলে ফেললে—"একদিন তুমিই এ-দলের সর্দার হবে দেখছি!"

ফ্যালারাম একটু হেসে বলেছিল—"আহা, বাবা শুনলে কি খুশীই হতেন!" কালুসর্দার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি।

পরের দিন সকাল থেকে ডাকাতদের সাজগোজ দেখে ফ্যালারাম একটু অবাক হয়ে গেল। ব্যাপার কি? একজন ডাকাতকে ডেকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে—"বাঃ, আজ যে চৌধুরী-বাড়ী লুঠ হবে, জান না?"

ফ্যালারাম কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে বললে—"ও, মনে ছিল না বটে!"

সমস্ত দিন ধরে ডাকাতদের কালীপূজা চলল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতির আয়োজন। দেখা গেল, ফ্যালারামের উৎসাহই সব চেয়ে বেশি। চরকির মত সারাদিন তার ঘোরার বিরাম নেই—সব কাজেই সে আছে।

সন্ধ্যে হতেই ডাকাতেরা সব তৈরি, এবার ঘড়া-ঘড়া সিদ্ধি এল—ফ্যালারামের পরিবেশনের উৎসাহ দেখে কে?

সর্দার বললে—"সিদ্ধিটা আজ বড় ভাল হয়েছে মনে হচ্ছে। ঘুঁটেছে কে?"

ফ্যালারাম সলজ্জভাবে বললে—"আমি।"

তারপর সেই বনের ভেতর অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠল। 'রণপা' পরে, ভুতের মত রঙ মেখে, মশাল নিয়ে শ'খানেক ডাকাত যখন সেই বন থেকে একসঙ্গে 'কুকি' নিয়ে বেরুল, তখন মনে হল প্রলয়ের বুঝি আর দেরী নেই।

একপ্রহর রাতে ডাকাতদের আসবার কথা। জমিদার চৌধুরীমশাই প্রাণটি হাতে নিয়ে প্রাসাদের সিংদরজা খুলে বসে আছেন। ডাকাতেরা এলে বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের হাতে ধন-প্রাণ সপে দেবেন—তারপর তারা যা খুশি করুক।

হঠাৎ বাইরে ভীষণ সোরগোল শোনা গেল। আর দেরী নেই বুঝে জমিদারমশাই প্রস্তুত হয়ে বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! সোরগোল বেড়েই চলল, অথচ ডাকাতদের আসবার নাম নেই। সোরগোলটাও যেন একটু অদ্ভুত রকমের। এ-তো ডাকাতদের আক্রমণের হুঙ্কার নয়, এ যে রীতিমত মারামারির শব্দ! তাঁর লোকজন তো সব গড়ের ভেতর, তবে মারামারি করছে কে?

আরও কিছুক্ষণ ভয়ে-ভয়ে অপেক্ষা করে জমিদারমশাই বাইরে লোক পাঠাতে যাচ্ছেন, এমন সময় উর্ধ্বশ্বাসে যে এসে ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে তো বাড়িসুদ্ধ সবাই একেবারে স্তম্ভিত! সে আর কেউ নয়, ধনঞ্জয়—জমিদারের বড় ছেলে।

প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠে জমিদারমশাই কিছু বলবার আগেই ধনঞ্জয় বললে—"দেরি করবার সময় নেই বাবা, শীগ্‌গির গোটাকতক মশাল আর কিছু দাড়ি দিয়ে জনকয়েক পাঠিয়ে দিন, আমি বাইরেই আছি।"

জমিদারমশাই আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে ধনঞ্জয় বেরিয়ে গেছে। রহস্য এর ভেতর যাই থাক, জমিদারমশাই ছেলের কথা এ-সময়ে অবহেলা করতে পারলেন না। জন-কতক বরকন্দাজ মশাল আর দড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে ডাকাতদের কি হয়েছে বলি। বন থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই তাদের মনে হল, সিদ্ধির নেশাটা যেন বড় বেশি হয়ে গেছে। সকলেরই কেমন যেন ঝিমুনির ভাব, পা চালাতে ইচ্ছা করে না। কালুসর্দারের নিজের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম, তবুও সকলকে ধমকে দিয়ে সে একরকম তাড়িয়েই নিয়ে আসছিল। বিপদের ওপর বিপদ, খানিকদূর যাওয়ার পর মশালগুলো আপনা থেকেই নিবে যেতে লাগল। কোনরকমেই সেগুলোকে আর জ্বালিয়ে রাখা গেল না। মশালগুলোতে মশলাই কম দেওয়া হয়েছে। মশাল-তৈরির ভার যাদের ওপর ছিল, তারা তো ভয়ে অস্থির। এখন কিছু না বললেও পরের দিন সর্দারের কাছে এর কৈফিয়ৎ দিতে তাদের কি অবস্থা হবে, তারা জানে।

মশালগুলো নিবে যাওয়ার পর অন্ধকারে তাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। কালুসর্দার হঠাৎ একসময়ে জিজ্ঞেস করলে—"ফ্যালারাম কোথায় ?"

কে একজন জানালে যে, ফ্যালারাম তাদের ছাড়িয়ে অনেক আগে চলে গেছে।

"চলে গেছে কি হে ? পথ চিনতে পারবে না যে !"

"কি জানি সর্দার, তার যা উৎসাহ, ধরে রাখে কে ?"

কিন্তু চৌধুরি বাড়ির কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ অন্ধকারে একটা লোক তাদেরই দিকে ছুটে আসছে মনে হল।

সর্দার হাঁকলে—"কে ?"

লোকটা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললে—"আমি ফ্যালারাম। একটু এগিয়ে ওদের ব্যাপারখানা দেখতে গেছলাম, সর্দার।"

কালু সর্দার খুশি হয়ে বললে—"বেশ-বেশ, কি দেখলে ?"

"লোকজন ওদের সব তৈরি হয়ে আছে, কিন্তু এক কাজ করলে ওদের ভারি জব্দ করা যায় সর্দার। আমরা দুদলে ভাগ হয়ে যদি ওদের সামনে-পেছনে দুদিক থেকে চেপে ধরি, তাহলে ওদের জারিজুরি সব এক দণ্ডে ভেঙ্গে যায়।"

সর্দার খানিক ভেবে বললে—"এ-তো মন্দ যুক্তি নয়। কিন্তু ঠিক ওরা কোথায় আছে, জান তো ?"

"গিয়ে দেখে এলাম, আর জানি না ?"

কালু সর্দারের হুকুমে একদল এবার চৌধুরী-বাড়ির সামনে দিয়ে অগ্রসর হল, আর একদলকে পেছন দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ফ্যালারাম।

অন্ধকার রাত, সঙ্গে মশাল নেই, তার ওপর নেশায় সবাই বুঁদ হয়ে আছে। ফ্যালারাম খানিকদূর গিয়ে—"এই জমিদারের লাঠিয়াল"—বলে দেখিয়ে দিতেই ডাকাতেরা বেপরোয়া ভাবে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে শত্রু, কে মিত্র, বোঝাবার তাদের তখন ক্ষমতা নেই।

কালুসর্দারও যে ব্যাপারটা প্রথমে বুঝেছিল, তা নয়। জমিদারের লোকের সঙ্গে যুঝছে ভেবে সে পরমানন্দে লাঠি চালাচ্ছিল। হঠাৎ চারধারের অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠল। ডাকাতেরা অধিকাংশই তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ও নেশার ঘোরে মাটিতে শয্যা নিয়েছে। কালুসর্দার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে—মাটিতে যারা পড়ে আছে, তারা সবাই তার দলের লোক। জমিদারের লোকেরা তখন তাদের মধ্যে যারা কম আহত হয়েছে, তাদের হাত-পা বাঁধতে সুরু করেছে। এরকম ভাবে প্রতারিত হয়ে রাগটা তার কিরকম হল বুঝতেই পারো, তার ওপর যখন সে দেখলো যে ফ্যালারাম তার কাছেই দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে, তখন তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না।

"বুঝেছি, এসব তোরই কাজ। তোর শয়তানির আজ উচিত শাস্তি দেব।"—বলে উন্মাদের মত সে ফ্যালারামের দিকে লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল। জমিদারের একজন বরকন্দাজ সেই মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করে একটা বল্লম ছুঁড়ে মারল, কিন্তু সে বল্লম সর্দারের গায়ে বেঁধবার আগেই ফ্যালারামের লাঠির ঘায়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কালুসর্দার এবার অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাঠিসুদ্ধ হাত তার আপনা থেকেই নেমে এল।

ফ্যালারাম একটু হেসে বললে—"যাক্, শোধ-বোধ হয়ে গেল সর্দার। আমাকেও তুমি বল্লমের ঘা থেকে বাঁচিয়েছিলে। এখন ইচ্ছে হয় লড়তে আসতে পার, আমি প্রস্তুত।"

কিন্তু সর্দারের তখন আর লড়বার ইচ্ছে নেই। মাথা নীচু করে লাঠির উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। জমিদারের লোকজন তখন চারধার দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলেছে। একজন তাকে বাঁধতে যাচ্ছিল, ফ্যালারাম হাত তুলে তাকে নিষেধ করে বললে—"ডাকাতি করলেও তোমার সঙ্গে মিশে দেখেছি, মন তোমার উঁচু আছে সর্দার। তোমায় ছেড়ে দিলাম। যেখানে খুশি তুমি যেতে পার।"

কালুসর্দার তবুও নড়ল না, হাতের লাঠিটা ফেলে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে—"মা কালী আমার ওপর বিরূপ হয়েছেন, নইলে সিদ্ধি খেয়ে আমাদের এত নেশাই বা হবে কেন, আর মাঝপথে মশালই বা নিবে যাবে কেন? এখন আমার আড্ডা ভেঙে গেছে, দলের লোক সব বন্দী। কোথায় আর আমি যাব। আমাকে বেঁধে নাও।"

ফ্যালারাম মাটি থেকে লাঠিটা কুড়িয়ে সর্দারের হাতে আবার তুলে দিয়ে বললে—"আচ্ছা, তার বদলে যদি তোমায় এ বাড়ির লাঠিয়ালদের সর্দার করে দেওয়া যায় ?"

কালুসর্দার অবাক হয়ে বললে—"আমায় ? আমি তো ডাকাত !"

ফ্যালারাম হেসে বললে—"তোমার মত ডাকাতই আমার দরকার। বাজে লোকের সঙ্গে লাঠি খেলতে খেলতে সব প্যাঁচ প্রায় ভুলতে বসেছি।"

কালুসর্দার হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলে—"তোমার দরকার ? তুমি কে তাহলে ?"

ফ্যালারাম একটু হাসলে। জমিদারের লাঠিয়ালেরা হেসে উঠে সর্দারকে ঠেলা দিয়ে বললে—"বোকারাম, জমিদারমশায়ের বড় ছেলেকে চেনো না।"

এবার কালুসর্দারের হাতের লাঠিটা আবার পড়ে গেল।

তারপর কালুসর্দার সারাজীবন চৌধুরী-বাড়ীতে একান্ত বিশ্বাসী হয়ে চাকরী করেছিল শোনা যায়। কিন্তু সিদ্ধি খেয়ে কেন যে সেদিন তার অত নেশা হয়েছিল, আর মশালগুলোই বা কেন যে মাঝপথে নিবে গেছল, কোনদিন সে তা বুঝে উঠতে পারেনি।

জটার কীর্তি

মহাশ্বেতা দেবী

কয়েকখানা বেত ভাঙল, বসার পাটি কয়েকখানা ছিঁড়ল, কখানা খাগের কলম হারাল, কতকগুলো তালপাতা ছিঁড়ল আর কত মাটির দোয়াত ভেঙে হীরেকষের খাসা কালি গড়াগড়ি গেল তার ঠিকানা নেই। কিন্তু গুরুমশাই, জটার পিসি, সবাই বুঝলেন জটাকে দিয়ে লেখাপড়া হবে না। গুরুমশাই বললেন, 'কাদাই গাঁয়ের কোন বামুনের ছেলেটা লেখাপড়া ছেড়ে বসে আছে বল দিখিনি ? আমি বলে দিলাম কাদু, ও ছেলে কেষ্ট গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবে।'

পিসি বলল, 'হ্যাঁ কাকা, তা বংশে ছেলে বলতে এট্টা, সে গরু হয়ে রইবে ? এমন করে ভোরবেলা মুড়ি-নাড়ু বেঁধে দিই, আসতে না আসতে তপ্তভাতে ঘি ঢেলে খেতে দিই, সাজিমাটি দিয়ে ধুতি কেচে কেচে হাত ব্যথা করে ফেলি, তবু ছোঁড়াটা লেখাপড়া শিখবে না ?'

'না বাছা, তুমি আর ওকে পাঠশালে পাঠিও না। অন্য ছোঁড়াগুলো অব্দি ওর দেখাদেখি গান বাঁধছে আর গাইছে। হরি বল! হরি বল!

গুরুমশাই রেগেমেগে চলে গেলেন। জটার পিসি উঠোনে লাউটা কুমড়োটা আজ্জায়, তা গুরুমশাইকে গাছের প্রথম ফলটা দেয়। গাই বিয়োলে কতদিন ধরে দুধ দেয়। ভাগের পুকুরের মাছটা, ওই জটার জন্যে কিছু তাঁর ভোগে এল না।

পিসি জটাকে বলল, 'গুরুমশাই ত জবাব দিল। যা, এবার কেষ্ট-লীলা গেয়ে ভিক্ষে করগা যা।'

এইসব শুনেটুনে জটা বুঝল আজ গতিক ভাল নয়। বলল, 'কেন ? ভিক্ষে করব কেন ?'

'কি করবি ?'

'দেওয়ানজীর ছেলের দলে গান গাইব।'

'আমায় এট্টা ঝামা দিয়ে যাস।'

'ঝামা !'

'হ্যাঁ, যেয়ে তার নাকটা ঘষে দিয়ে আসব। আমার দলে আয়। ছেলে খেপিয়ে দল বাঁধছে। নাবলে বাছুরটা ডাঙ্গার জঙ্গলে গেছে, ধরে আন্‌গা। আর রাখাল ছোঁড়া ফিরলে পরে উঠোনের মাচা বাঁধবি।'

অগত্যা জটা বাছুর খুঁজতে গেল। রাঙির বাছুরটা মহা ত্যাঁদড়। ছাড়া পেলেই ডাঙ্গার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে।

যেতে যেতে জটা ভাবল, পিসি যে কি বলে!

দেওয়ান মুকুন্দলালের কাছারি সেই ডাঙ্গাপাড়া। সেই দেওয়ানের ছেলে গোবিন্দ বলছে, তাকে গানের দলে নেবে। এ কি কম ভাগ্যির কথা? এখন ত তার বয়স সবে এগারো। যখন আরো বড়টা হবে তখন নাম হবে কত! তার মত গান বাঁধতে কোন্‌ ছেলেটা পারে?

মনের সুখে জটা গান ধরল, 'গোরো চন্দোর যবে নদে ছেড়ে গেলগো! আমি কোন সুখে হেথা রব, মোনের দুঃখে বোনে যাব!'

ওই গান শুনেই কেষ্ট হেঁকে বলল, 'কে রে? জটা?'

'হ্যাঁ! তুই কে?'

'কেষ্ট। কি করিস্‌?'

'নাবলে বাছুরটা খুঁজতেছি।'

'দেখ্‌গা যেয়ে বাগ্দীপাড়ায়। নবার বাপ নিয়ে বেঁধে রেখেছে। তাদের শাক লঙ্কা সব মুড়িয়ে একেবারে…।'

বাগ্দীপাড়া একখানা মাঠ পেরিয়ে। ঘন বনের ধারে। সবাই ভয় পায়। নবার ঠাকুরদা সেই বর্গীদের খুব ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে দেশছাড়া করেছিল। ওদের হাতে লাঠি-সড়কি-বর্শা শন শন বন বন চলে। সবাই বলে, ওই নবার বাপ, কাকা সব রাতেবিরেতে বেরোয়। ওরা না কি ভূত-প্রেতের সঙ্গে কথা কয়। নবার ঠাকুরদা সোজা লোক নয়। ওর যদি ইচ্ছে হয় তা হলে আঁধার রাতে নিজের ঘরে বসে একটা পিদিমকে মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দেবে। বাতাসে উড়ে সে-পিদিম গিয়ে ওর শত্রুর ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে। ওকে কেউ চটায় না। এমন কি গোবিন্দলালও না। নবার ঠাকুরদার যখন মনে হয় তখনি গিয়ে বলে, 'এক ডোল চাল, এট্টা মাছ, খেসারি আধমন আর ক'টা কুমড়ো দেন গো, এট্টু গান-বাজনা করি আর ভোজ খাই।'

গোবিন্দলাল দিয়ে দেয়। কে ওকে চটাবে বল? ওকে চটিয়েছিল, বাগ্দীদের ধান দেয়নি সেই জন্যেই ত গোলবদন সিঙ্গির মশারির মধ্যে গোখরো সাপ ঢুকে গিয়েছিল।

জটা ভাবল এবার বাছুরটাকে সব সময় বেঁধে রাখতে হবে। নয়ত নবার ঠাকুরদা একদিন দেবে একটা মন্ত্রপড়া পিদিম ছেড়ে। উঠোনের লাউ গাছ, লঙ্কা গাছ, সব নষ্ট করেছে, কি কাণ্ড!

ভাবতে ভাবতেই নবাদের বাড়ি পেঁছিল। দেখল নবার মা বিরস মুখে উঠোন ঝাট দিচ্ছে। নবার টিকির দেখা নেই। নবার টাকুরদা বাছুরটার দড়ি ধরে আমগাছের নিচে বসে আছে। বুড়োর চোখ দুটো দুপুরেই টকটকে লাল। দেখে নবার প্রাণ উড়ে গেল। 'ও বাগ্দীপিসি!'

নবার মা আশ্চর্য! রাগ করল না। ফিসফিসিয়ে বলল, 'মরতে হেথা এলে কেন? নবাটা যেয়ে দিয়ে আসত গা? উনি রেগে আগুন হয়ে বসে আছে।'

জটা শুকনো মুখে নবার ঠাকুরদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সর্বনাশ! বুড়ো যেন কি বিড়বিড় করে বলছে।

'ও আজামশাই!'

আজামশাই মানে দাদামশাই। গ্রামে সকলেই সকলকে দাদা, কাকা, পিসি বলে ডাকে। জটারা বামুন বলে সবাই অবশ্য ওদের ঠাকুর বলে, কিন্তু নবার ঠাকুরদা কারুকে কিছু বলে না।

'আজামশাই গো!'

'সব্বনাশ হবে, আমার খেত খাইয়ে খাইয়ে তুমি বাছুরকে নোলা বাড়িয়ে দিতেছ, তোমার…'

'মন্যি দিও না গো।' জটা ডুকরে কেঁদে উঠল।

'তবে কি করব, লাচব?' বুড়োর গলা একটু নরম।

'আমি পিসির থে' তোমায় কড়ি চেয়ে দেব একগণ্ডা।'

'কড়ি!'

'বুড়ো ঘোলা চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'বারবার তিনবার মোরা খেত আজ্জালাম, তিনবার খেয়ে দিল। যাও, কড়ি দিতে হবে না। তবে দেওয়ানজীর মন্দিরে এই রামাবস্যেয় (আমাবস্যা) মোর ছেলেরা পুজো দিতে যাবে, সেদিন হোথা গান গেয়ে দাও গা!'

'গান গাইব?'

'তাই ত বল্লু! এমন গান গাইবে যে সবে যেন মন দে শোনে। নিধেটাকে খবর করেছিলাম, সে বললে কাপড় নাই, এট্টা সিধে।'

'পিসি আমায় একা যেতে দেবে না।'

'মোর ছেলেরা মাথায় করে নে যাবে।'

মাথায় করে না হক, ওদের গরুর গাড়িতেই জটা কাছারি গিয়েছিল। গিয়েছিল বলেই দেখেছিল গরুর গাড়ির ভেতর খড়ের নিচে এই বড় বড় সড়কি আর লাঠি। নবার বাপ বলছিল, 'উদিকে যেমন গান হবে, ইদিকে তেমনি।'

নবার কাকা বলল, 'গোলবাড়িতে যেয়ে কি হবে? তার চে' মন্দিরের পেছনের পাকা ঘরে য্যাত বাসন।'

'তোর মাথা। সোনারুপোর ইট রইতে কেও বাসন নেয়?'

জটা গাড়ির ভেতরে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল, জটা সব শুনল। শুনে ওর বুকের ধুক ধুকানি বেড়ে গেল। ওরা ভেবেছে কি? জটা ত সেই কবে শুনেছে একেকটা ডাকাত ধরতে পারলে মোটা টাকা দেয় কোম্পানী, তাই মুকুন্দলাল খালি খালি খোঁজ নেয় কার কাছে রণ-পা আছে, কে রাতবিরেতে বেরিয়ে ভোররাতে ধানচালের বস্তা কাঁধে বাড়ি ফেরে। বাপরে মুকুন্দ দেওয়ান যদি নবার বাপ কাকাকে ধরায় তবে নবার কর্তাদাদা নিয্যস পিদিম চালা করে সকলের সর্বনাশ করবে, নয়ত সাপচালা করে ছেড়ে দেবে।

ভয় পাচ্ছিল বলেই দেওয়ানবাড়ি পেঁছে জটা বলল, 'মুখে মাথায় জল দিয়ে আসতেছি এট্টুনি। দেহ যেন কেমন কেমন বলছে।'

'চল্ বাবা চল্!' দেওয়ানের সে কি আদর। আদর করে জটাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, অঙ্কুরের ছেলে না তুই? বেশ গান করিস্ শুনি। তা আজ বাবা গান গেয়ে সব ভুলিয়ে রাখতে হবে। সব যেন গুড়ের রসে মাছির মত ডুবে থাকে। গোরাবাজার থে সাহেব পজ্জন্ত আসছে পুজো দেখতে, গান শুনতে, জানলে বাবা?'

'আজ্ঞা!' জটার চোখে জল এসে গেল। আহা, আগে কেন বোঝেনি গো! এখন নিশ্চয় একটা ধরপাকড় হবে। মুকুন্দ দেওয়ানের তিন চারটে কাছারিবাড়ি লুট হয়ে গেছে এ কি সোজা কথা। কিন্তু নবার বাবা কাকা কি দোষ করল? যদি দোষ না করে তবে ওরা গরুর গাড়ির ভেতরে কেন···যা, জটার মাথা গুলিয়ে গেল। গান গাইতে পেলে ওর আহার নিদ্রা ঘুচে যায়, এখন গান অব্দি ভাল লাগল না।

ওদিকে ঝম্‌ঝমিয়ে খোল করতাল আর বাঁশি বেজে উঠল।

জটা আগেই বসে গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের গান আর শচীমায়ের দুঃখের গান দুটো গেয়ে নিল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে গান ধরল।

'বসে কি ভাবতেছ মন, শিরে শিরে শমন, তা জান কি?'

সবাই বলল, 'বাহা, বাহা! মোদের জটা ত ভাল বলছে গান?'

জটা গাইতে লাগল ঃ

'শিরে শমন, বাইরে শমন, শমন তোমার আসছে তেড়ে!

তোমার গাড়ি-বোঝাই সড়কি লাঠি, সে সোমবাদ সে জেনেছে রে।'

মুকুন্দলাল হঠাৎ কটমট করে চাইলেন। নবার বাবা আর কাকা এ ওর দিকে চাইল। তারপর চেয়ে দেখল ভিড় বিস্তর, তবে চাতালের একদিকে ফাঁক আছে।

'করবে তোমায় গারদগাড়া, ডাকাত বলে ধরা করাবে।

কেমন করে বাঁচবে ভাব, সময় হাতে রয়েছে রে।

একবার ডাক কালী বলে, তারপরেতে পেলিয়ে বাঁচো

লইলে এবার মরলে তুমি, ক্যাঁকে (কোমরে) উঠল দড়িগাছো।'

কালীকীর্তন এমন কেউ শোনেনি, তাই নিয়ে কে কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ সদর দেউড়ির ওপারে ঘোড়ার টগবগ শব্দ শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কাদাই গাঁয়ের বাগদীরা কালী! কালী! বলে হুঙ্কার দিতে দিতে তিনলাফে চাতাল পেরিয়ে আঁধারে মিশে গেল।

ধর্ ব্যাটাদের। মুকুন্দলালের হুঙ্কার শুনে জটা আর জটাতে নেই। সেও একছুটে বেরিয়ে গিয়ে একলাফে ছুটন্ত গরুর গাড়িতে উঠে বসল। নবার বাবা বলল, 'হোথাকে কেন ঠাকুর?'

জটাকে ঘাড়ে বসিয়ে ওরা কালী কালী বলতে বলতে ছুটতে লাগল।

পরদিন সকালেই জটা পোড়োপাটি আর খাগের কলম নিয়ে পাঠশালায় গেল। আর কেন কে জানে, জটাদের উঠানে রাত হলেই ধুপধাপ শব্দ করে কারা যেন ধামা-ধামা শিম, বেনুন, মুলো, শাক নামিয়ে দিয়ে যেতে লাগল। জটা সব জানে তবু চুপ করে রইল।

এখন জটা শুধু লেখে আর পড়ে। মোটে গান গায় না। পিসি বলে এসব ঠাকুরপুজোর ফল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শঙ্খ ঘোষ

উনিশ শতকের বীরসিংহ গ্রাম। তখনকার দিনের হুগলী, আজকের দিনের মেদিনীপুর জেলা। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

কোমরগঞ্জ গ্রামের হাট থেকে ফিরছেন এক ব্রাহ্মণ যুবক, চলেছেন বীরসিংহের পথে। উলটো পথে হনহনিয়ে আসছেন এক বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ। দুজনে মুখোমুখি হতেই বৃদ্ধটি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে, একটি এঁড়েবাছুর হয়েছে—দেখবি আয়।

বাড়িতে ছিল এক আসন্নপ্রসবা গাই। তাই ঘরে ফিরে যুবকটি ব্যস্ত হয়ে চললেন গোয়ালঘরে এঁড়েবাছুর খুঁজতে। কিন্তু কই? বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, ওদিকে নয় বাপু, এদিকে এসো।

নিয়ে এলেন তাঁকে আঁতুড়ঘরের সামনে। এই এঁড়েবাছুর? কী কাণ্ড!

বৃদ্ধ পিতামহ বললেন—দেখে নিয়ো, বড়ো হয়ে এ ছেলে এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে না হয়ে যায় না। অর্থাৎ মনে মনে চাইলেন তিনি, যেন এ ছেলে তেমনি হয়। একগুঁয়ে—নিজেরই মতো।

ওই একগুঁয়ে এঁড়েবাছুরটিরই নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষকমশাইরা নাম রাখলেন বিদ্যাসাগর। দেশের লোকে বলল দয়ার সাগর। এখন আর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় না, এখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মা ভগবতী দেবী। ঠাকুরদা রামজয়

তর্কভুষণ। ঠাকুরদাসের নিজের জীবন ছিল কষ্টের, তাঁর মা কোনো রকমে চরকায় সুতো কেটে দিন চালাতেন। চোদ্দ বছর বয়সে উপার্জনের পথ খুঁজতে ঠাকুরদাস এলেন কলকাতায়। পরের আশ্রয়ে থেকে কোনমতে ইংরেজীটা শিখতে লাগলেন। রাত্রে খাওয়া জুটত না প্রায়ই, কোন কোন দিন দিনেও না। শরীর শুকিয়ে আসতে লাগল দিন দিন।

শেষ পর্যন্ত দু টাকা মাইনেতে এক কাজের জোগাড় হল। সেই খবর নিয়ে রীতিমতো উৎসব পড়ে গেল দেশের বাড়িতে।

তেইশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হল ভগবতী দেবীর সঙ্গে। তখন তাঁর মাইনে বেড়ে হয়েছে আট টাকা।

বিদ্যাসাগরের ছোটবেলাকার কথা বলতে গেলে দুটি লোকের নাম না করলেই নয়। একজন এই ভগবতী দেবী, আরেকজন ঠাকুরদা।

ভগবতী দেবীর ছিল দয়ার শরীর। চারপাশের লোকজনের সামান্য কষ্ট দেখলে তাঁর আর স্বস্তি থাকত না। সেই চরিত্রই দেখা দিয়েছিল ছেলেরও জীবনে।

একবার বীরসিংহের বাড়িটা গেল পুড়ে। বিদ্যাসাগর মশাই মাকে নিয়ে যেতে চাইলেন কলকাতায়। মা বললেন, তা কি হয় রে, যেসব গরীব ছেলে আমার এখানে খেয়েদেয়ে ইস্কুল করে তাদের দেখবে কে?

একদিনের পুজো—তার জন্যে খরচের অন্ত নেই কোন। মা বললেন, কী দরকার পুজোর? যদি তার চেয়ে গাঁয়ের গরিবগুলো ক'টা দিন রোজ দুমুঠো খেতে পায়, সেই কি ভালো নয়?

সেসব দিনে এই কথা বলা, দেবতা সম্পর্কে এমন অবিশ্বাসীর মত বলা সহজ ছিল না কিন্তু। এ ছিল প্রায় পাপের সামিল। তবে সে পাপ করতে কোন কুণ্ঠা ছিল না ভগবতী দেবীর।

একেই বলে সংস্কারমুক্তি। কুসংস্কারগুলোই মানুষকে বেঁধে রাখে—তাকে মানুষ হতে দেয় না ঠিকমতো। বিদ্যাসাগরের জীবনে কোনখানেই যে সেই সংস্কারের ছায়ামাত্র নেই, এখানে তিনি তাঁর মায়েরই উত্তরাধিকারী।

আর ছিলেন ঠাকুরদা। বিদ্যাসাগরমশাই তাঁর ছোটো আত্মজীবনীতে ঠাকুরদার কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন বারে বারে: ঠাকুরদার আত্মসম্মানবোধ আর জীবনের নিষ্ঠাই নাতির মন ভুলিয়েছিল।

ঠাকুরদার শারীরিক ক্ষমতা নিয়েও নানা গল্প শোনা যায়। একবার না কি পথে আসতে আসতে হঠাৎ এক ভালুক পড়ল তাঁর সামনে। ভালুকটি তাঁকে ধরতে যেতে উলটে তিনিই তাকে ধরলেন। গাছের সঙ্গে ঘসে ঘসে শেষ পর্যন্ত একটা লোহার ডান্ডা

দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেললেন ওটাকে; তারপর নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এলেন ঘরে।

ঈশ্বর কখনোই স্বাস্থ্যবান্ ছিল না, কিন্তু এই দুরন্ত শক্তি ছিল তারও মধ্যে। তার শখের খেলা কপাটি আর লাঠি। কলকাতা থেকে দেশে ফিরলেই সবচেয়ে আগে লাফিয়ে পড়ত সে কপাটি খেলায়। তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সবচাইতে যার গায়ের জোর বেশী, আর কেউ যার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না, সেই গদাধরকেও ঈশ্বর অবলীলায় কাবু করে ফেলত এই কপাটিতে।

বুড়ো বয়সের বিদ্যাসাগরকে দেখে কি ভাবা যায় যে ছেলেবেলায় লোকটি ছিলেন ভারি দুষ্টু?' ঠাকুরদাস তাকে ডাকতেন 'ঘাড়কেঁদো'। বলতেন, 'বাবা যে এঁড়েবাছুর বলেছেন, সে-কথা কি মিথ্যে হবে!' এই একগুঁয়েমির জন্য বাবার কাছে কিন্তু বেদম মার খেতে হতো ঈশ্বরকে, পাড়াপড়শিদের ঠেকাতে আসতে হতো।

হয়তো বাবা বললেন, ঈশ্বর আজ ইস্কুলে যাবে না।

ব্যস, কার সাধ্য সেদিন ঈশ্বরকে ঘরে রাখে। ইস্কুলে তার যাওয়া চাই-ই চাই। বাবা বললেন, ঈশ্বর, আজ স্নান করবে।

কে তাকে স্নান করায় সেদিন! জোর করে পুকুরে নামিয়ে দিলেও সে ছেলে দাঁড়িয়ে থাকবে খাড়া।

এই দেখে-দেখে বাবা অবশ্য খুব মজার উপায় বার করেছিলেন একটা। বলবার বেলায় তিনি উলটো করে বলতেন। যেমন, আজ ঘরে পরিষ্কার কাপড় নেই, কী করা যায়। বললেন—ঈশ্বর, আজ ধবধবে কাপড় পরে ইস্কুলে যাবে। ব্যস, সে ময়লা কাপড় পরেই রওনা।

শুধু তাই নয়। আরো হাজার রকম দুষ্টুমিতে ছিল তার মাথা ভরা। একে জ্বালানো, ওর বাড়িতে হামলা করা, এ হলো ঈশ্বরের নিত্য কাজ। তাই বলে সবটাই কি দুষ্টুমি? পড়াশুনার বেলায়? সে-বেলায় কিন্তু দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিল হয় না ঈশ্বরের। পড়ায় তার অগাধ মনোযোগ, একাগ্র উৎসাহ। মাথাও তেমনি।

পণ্ডিতমশাই তো 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে অস্থির। এমন স্মৃতি দেখা যায় না বড়ো। পাঠশালায় এক বছর পড়তে না পড়তেই পড়তে লাগল। হলে কী হয়, শরীরই যে টিকছে না। বেচারা শক্ত রকম অসুখে ভুগে-ভুগে জীর্ণ হয়ে পড়া বন্ধ হলো ছেলের। বছরখানেক ওই-ভাবেই কাটাবার পর আবার ধীরে-সুস্থে শুরু হলো পড়া।

কিন্তু শরীর অমন রুগ্ন হলে কী হয়, মেধা ছিল অসম্ভব।

একবার বাপ-ছেলে কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে চলে আসছেন কলকাতায়। তখন তো আর গাড়ি চলাচলের এমন ব্যবস্থা ছিল না। আর যাও বা ছিল তাতে করে চলাফেরা

করা কি গরীব লোকের পোষায় ? তাই হেঁটে চলা। চলতে চলতে ছেলে দেখল, রাস্তার ধারে ধারে বাটনা-বাঁটা শিল। 'বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোঁতা কেন ?'

'শিল নয়রে বোকা! ওগুলো মাইল-স্টোন।'

সে আবার কী জিনিস ? বাবা বুঝিয়ে দিলেন, মাইল মানে আধ ক্রোশ আর স্টোন হলো পাথর। আধক্রোশ পর পর ঐরকম একটা করে পাথর বসানো কেন ? ওটা হলো দূরত্বের চিহ্ন। কলকাতার এক মাইল দূরে যে পাথর তাতে 'এক' লেখা আছে, এটাতে 'ঊনিশ'। তার মানে, আমরা কলকাতা থেকে ঊনিশ মাইল দূরে আছি। দেখে শুনে ঈশ্বর বলল, এটা তবে ইংরেজীর 'এক' আর এটা 'নয়' ? বেশ, ছেলে তখন মনে মনে ঠিক করল, পথেই সে ইংরেজী অঙ্ক শিখে নেবে। আর কী আশ্চর্য, শিখলও। ঊনিশ থেকে দশ পর্যন্ত এসে খুব নিশ্চিন্ত মুখে জানিয়ে দিল, বাবা, আমার ইংরাজী অঙ্ক শেখা হলো। এক থেকে দশ পর্যন্ত দেখে নিয়েছি।

বাবা তো অবাক! বলে কী! আচ্ছা পরীক্ষা হোক। বলো, এটা কত ? নয়। এবার ? আট। এবার ? সাত।

ও, তাই বলো। বাবা বুঝতে পারলেন ছেলে আন্দাজে বলছে। উলটো দিক থেকে পর পর বলে যাচ্ছে। তাই তিনি একটা চালাকি করলেন। ছয়ের মাইল-স্টোনটা না দেখিয়ে ঐ সময়ে তাকে অন্যমনস্ক রেখে, একেবারে পাঁচের অঙ্কে এসে পড়লেন। বলো, এবার কত ?

তখন পরবর্তীকালের বিদ্যাসাগর, তখনকার সেই ঈশ্বর, একটু জব্দ করল বাবাকে। 'বাবা, এটা হবে ছয়—কিন্তু ভুলে লিখেছে পাঁচ।'

এই গল্প শুনে ঠাকুরদাসের বন্ধুরা তো খুশি। স্বজন বান্ধব সবাই বললেন, বাঃ, বাঃ, তুখোড় ছেলে! এ রকম ছেলে যে বড়ো হয়ে বিরাট পুরুষ হবে তাতে আর সন্দেহ কী ? অবিশ্যি তাঁদের বিরাটত্বের ধারণা শুনলে আজ আমাদের হাসি পাবে। তাঁরা ঠিক করলেন, হিন্দু কলেজে পড়লেই ইংরেজী শেখার চূড়ান্ত হবে। মোটামুটি শিখতে পারলেও সাহেবদের বড়ো বড়ো দোকানে অনায়াসে কাজ পাওয়া যাবে। তাহলে আর ভয় কী!

ইচ্ছের দৌড় কত! তবু কলকাতায় পড়াই সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু কলেজ নয়, তার পাশেই সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিখতে হবে। যেতে হবে গ্রাম থেকে শহরে। দেশের নতুন শিক্ষার কেন্দ্র—নতুন শহর—মহানগরী কলকাতা।

●